International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-V, June2016, Page No. 1-24
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

সুন্দরবন অঞ্চলে কাঁকড়া ধরায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যগতজ্ঞান, লোকবিশ্বাস-সংস্কার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয়

অপূর্ব রায়
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (ইউ.জি.সি) লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Sundarban is the largest mangrove delta in the world. The one third of the total Sundarban is within India. There are 44,56,259 people live in nineteen blocks. In India, Sundarban have 106 deltas. Till now, there is no electricity in several areas. The people who live in coastal areas (nearby Sundarban) are engaged in several professions like honey collection, fishing, catching crabs and shrimps, cutting woods. The people, who are engaged in these professions, are applying their traditional knowledge in their job. Among those professions, the crab hunting is the most important job, which is entirely based on traditional knowledge. The people, who are involved in this profession is called 'Crab Hunter'. In this profession people apply three procedures to collect crabs. Many people of this profession are taking written permission from the forest department to go for crab hunting in the forest. They know that they have no guarantee of returning home after their crab hunting in the river because death follows them in every step. Instead of knowing, that they go to the forest for crab hunting. We will discuss the traditional process of crab hunting, socio-economic status and folk beliefs of these people related to this type of traditional profession.

Keywords: Crab Hunting or Catching, Don, Thobga, Gartotara, Banabibi, Chapan, Traditional Knowledge.

ভূমিকা:

নিম্ন-বঙ্গীয় অঞ্চলে গঙ্গা ও পদ্মার পলি সঞ্চয়ের ফলে যে ব-দ্বীপ গড়ে উঠেছে তা এশিয়া তথা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হল সুন্দরবন, যা আজ 'World Heritage Site' হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চল দুটি দেশের মধ্যে বিভক্ত। বাংলাদেশের সুন্দরবন বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতখিরা জেলার অন্তর্গত। আবার ভারতীয় সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত প্রায় উনিশটি থানা সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। ভারতীয় সুন্দরবনের অধিকাংশ অঞ্চল আজও পর্যাপ্ত পরিমাণে আধুনিকতার স্পর্শ পায় নি। এখানে এখনও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, উন্নত সড়কপথ গড়ে ওঠে নি। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হয় নি। এখানকার অধিবাসীদের মৃত্যুর সঙ্গে

লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। এখানে না আছে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, না আছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা। সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবন এখানে দুর্বিসহ। নানা শ্রমজীবী মানুষের সহাবস্থান রয়েছে এই সুন্দরবন অঞ্চলে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এই সুন্দরবনের মানুষজন কখনও চাষবাস, আবার কখনো জঙ্গলের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। যারা ভূমিহীন, যারা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের অধিকাংশেরই জীবিকা হল মাছ ধরা, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনা, মীন (বাগদা চিংড়ির বাচ্চা) ধরা, কাঁকড়া ধরা, মধু সংগ্রহ করা। এমনই একটি উল্লেখযোগ্য পেশা হল কাঁকড়া ধরা। এই অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের পেশাগত তেমন কোন নাম নেই। এদের মৎস্যজীবী হিসেবেই ধরা হয়। সাধারণত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় এরা কাঁকড়া ধরতে যায়। মাসে প্রায় ১০-১২ দিন এরা কাঁকড়া ধরে। জীবনের পরোয়া না করেই এরা জঙ্গলে যায় এবং নিজেরাও জানে জঙ্গল থেকে তারা নাও ফিরতে পারে। তবুও জীবন-জীবিকার তাগিদে তাদের জঙ্গলে যেতে হয়, যুদ্ধ করতে হয় বাঘ, কুমির, বিষধর সাপেদের সঙ্গে। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হল যারা কাঁকড়া ধরে তাদের কাঁকড়া ধরা সম্পর্কিত ঐতিহ্যগত জ্ঞান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও লোকবিশ্বাস-সংস্কার। কাঁকড়া ধরে যারা তাদের অধিকাংশেরই জমি-জমা নেই বললেই চলে। ফলে সারা বছর জঙ্গলের মাছ, কাঁকড়ার ওপর নির্ভর করতে হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে জঙ্গলের ওপর নির্ভর করেই এদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়। মাসে ১০-১২দিন কাঁকড়া ধরার সুযোগ থাকলেও বর্তমানে কাঁকড়াজীবীরা কাঁকড়া ধরার ক্ষেত্রে সুন্দরবন অঞ্চলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। কাজেই আলোচ্য প্রবন্ধে এসবের পাশাপাশি তাদের কাঁকড়া ধরা সম্পর্কিত ঐতিহ্যগত জ্ঞান, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জঙ্গলকেন্দ্রিক বিশ্বাস-সংস্কার সবিস্তারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১. সুন্দরবন অঞ্চলের পরিচয়:

ভূ-তাত্ত্বিকদের মতানুসারে সুন্দরবন অঞ্চলের জন্ম বেশি দিনের নয়। আনুমানিক তিন থেকে চার হাজার বছর পূর্বে আজ যেখানে সুন্দরবন তা একসময় ছিল সমুদ্রগর্ভে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা-পদ্মার পলি জমে অজস্র দ্বীপের সৃষ্টি হয়, যা ছিল বাদাবন, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ১৮৮৫ সাল নাগাদ যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হিংকল সুন্দরবনে তিনটি আবাদের পত্তন করেন। তার মধ্যে অন্যতম হল হিঙ্গলগঞ্জ। বলা যেতে পারে, এই সময় থেকেই সুন্দরবনের জঙ্গল সরিয়ে আবাদ জমির পত্তনের কাজ শুরু হয়। চালু হয় ইজারাদারি পদ্ধতি। প্রশাসনের সক্রিয় উদ্যোগেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। অরণ্যাকীর্ণ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লাটে লাটে বিভক্ত হয়ে যায়। লাটের ইজারাদারি পাবার জন্য আসতে থাকে বড় বড় জমিদার, ব্যবসাদার, উকিল, ব্যারিস্টার। এই কারণে ১৮২৫-৩০ সালে এবং ১৮৫৩ সালে জমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে নতুন নতুন নিয়ম তৈরি হয়। ১৮৬০-সালের পর প্রথম ভারতবর্ষে বন পরিচালন বিভাগ গড়া হয়। এবং সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল এই আওতায় অধীনস্থ হয়। ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষের প্রভাবশালী শাসক। এই সময় ইংরেজ সরকার লক্ষ্য করে যে, সুন্দরবন অঞ্চলের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ম্যানগ্রোভ অরণ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরে ১৮৯৩-৯৮ সমকাল নাগাদ ইংরেজরা প্রথম লিখিতভাবে বন রক্ষণাবেক্ষণ আইন প্রণয়ন করে এবং সমগ্র সুন্দরবনের ঘন ম্যানগ্রোভ জঙ্গল সংরক্ষিত জঙ্গল হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৪৩ সাল থেকে এই সুন্দরবন জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে বনবিভাগ। আর এই সময় থেকেই সুন্দরবন জঙ্গল সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়। একসময় সুন্দরবনের আয়তন অনেক বড় ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কালক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সে সুন্দরবনের ভূ-প্রকৃতির বারংবার পরিবর্তন ঘটেছে। আজ যেখানে কলকাতা তা যে একসময় সুন্দরবন হিসেবে পরিগণিত ছিল, তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। যেমন ১৮৩৫-সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪০-সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কলকাতার ফোর্টউইলিয়ামে এক গভীর কূপ খননের সময় সুন্দরী গাছের অংশ উঠেছে। তাছাড়া আজ যেখানে শিয়ালদহ সেখানে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পুকুর খননের সময়ও প্রচুর সুন্দরীগাছের অংশ পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক কারণ বা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাই হোক না কেন, সুন্দরবনের আকার ও আয়তন সময় পরিবর্তনের সঙ্গে তা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। আজ ভারতীয় সুন্দরবন উত্তর ২৪ পরগণার ৬টি ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৩টি, মোট ১৯টি ব্লক নিয়ে গঠিত।

২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী সুন্দরবন অঞ্চলের কিছু তথ্য প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপিত হল :

সংখ্যা	ব্লক	আয়তন	গ্রাম সংখ্যা	জনবসতি	জনঘনত্ব
১	ক্যানিং-১	২০৪.৩৪ বর্গ কিলোমিটার	৬১ টি	৩০৪৭২৪ জন	১৪৯১/বর্গ কিলোমিটার
২	ক্যানিং-২	২২২.০০ বর্গ কিলোমিটার	৬২ টি	২৫২৫২৩ জন	১১৩৭/বর্গ কিলোমিটার
৩	বাসন্তী	২৮৬.০৩ বর্গ কিলোমিটার	৬৭ টি	৩৬৬৭১৭ জন	১২৮২/বর্গ কিলোমিটার
৪	গোসাবা	২৮৫.৮৫ বর্গ কিলোমিটার	৫১ টি	২৪৬৫৯৮ জন	৮৬২/বর্গ কিলোমিটার
৫	জয়নগর-১	১২৬.০২ বর্গ কিলোমিটার	৫১ টি	২৬৩১৫১ জন	২০৮৮/বর্গ কিলোমিটার
৬	জয়নগর-২	১৭৫.১৮ বর্গ কিলোমিটার	৪৯ টি	২৫২১৬৪ জন	১৪৩৯/বর্গ কিলোমিটার
৭	কুলতলি	২৩৯.৪৮ বর্গ কিলোমিটার	৪৬ টি	২২৯০৫৩ জন	৯৫৬/বর্গ কিলোমিটার
৮	মথুরাপুর-১	১৪৮.২৯ বর্গ কিলোমিটার	৯৯ টি	১৯৫১০৪ জন	১৩১৫বর্গ কিলোমিটার
৯	মথুরাপুর-২	২৩০.৫১ বর্গ কিলোমিটার	২৭ টি	২২০৮৩৯ জন	৯৫৮/বর্গ কিলোমিটার
১০	পাথরপ্রতিমা	৪৬৯.০৫ বর্গ কিলোমিটার	৯২টি	৩৩১৮২৩ জন	৭০৭/বর্গ কিলোমিটার
১১	কাকদ্বীপ	২৫১.১০ বর্গ কিলোমিটার	৩৯ টি	২৮১৯৬৩ জন	১১২২/বর্গ কিলোমিটার
১২	সাগর	৫০৪.০০ বর্গ কিলোমিটার	৪৭ টি	২১২০৩৭ জন	৪২০/বর্গ কিলোমিটার
১৩	নামখানা	২২৭.১৪ বর্গ কিলোমিটার	৩৯ টি	১৮২৮৩০ জন	৮০৪/বর্গ কিলোমিটার
১৪	হারোয়া	১৫২.৮১ বর্গ কিলোমিটার	৯০ টি	২১৪৪০১ জন	১৪০৩/বর্গ কিলোমিটার
১৫	মিনাখা	১৫৭.১২ বর্গ কিলোমিটার	৭৫ টি	১৯৯০৮৪ জন	১২৬৭/বর্গ কিলোমিটার
১৬	হাসনাবাদ	১৫৫.৪৪ বর্গ কিলোমিটার	৭৫ টি	২০৩২৬২ জন	১৩০৭/বর্গ কিলোমিটার
১৭	সন্দেশখালি-১	১৮১.২০ বর্গ কিলোমিটার	৩০ টি	১৬৪৪৬৫ জন	৯০৭/বর্গ কিলোমিটার
১৮	সন্দেশখালি-২	১৯৭.২৭ বর্গ কিলোমিটার	২৪ টি	১৬০৯৭৬ জন	৮১৬/বর্গ কিলোমিটার
১৯	হিঙ্গলগঞ্জ	২৩০.৪০ বর্গ কিলোমিটার	৪৪ টি	১৭৪৫৪৫ জন	৭৫৭/বর্গ কিলোমিটার

সুন্দরবন অঞ্চলের জনবিন্যাস আজ নানা জাতি-জনজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষজন নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে যে সমস্ত তপশিলী জাতি-জনজাতি ভুক্ত সম্প্রদায় রয়েছে তারা হল-পৌণ্ড্র, রাজবংশী, ব্যাঘ্রক্ষত্রিয়, কাহার, নমঃশূদ্র, ভূমিজ, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, বাগদি, বৈদ্য, ভূঁইয়া, ভূইমালি, চামার, ধোবা, হাড়ি, জেলে, কৈবর্ত, কাঁওরা, মাল, শুঁড়ী, তিয়া, তুরী প্রভৃতি। আসলে ইংরেজ আমল থেকেই এদের সমাগম ঘটতে থাকে। এর পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজের মন্ত্র' শীর্ষক গ্রন্থটিতে সুভাষ মিস্ত্রীর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে সুন্দরবনে আজ এত সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সহাবস্থানের মূলে রয়েছে:

- জীবিকার তাড়না;
- পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ, কাঁকড়া, মধু, কাঠের যোগান;
- বন পরিষ্কার করে জমি দখলের আশা;
- শিকারের বাসনা;

যদিও এর কোনটিকেই বাদ দেওয়া যায় না। আসলে ইংরেজ আমলেই জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে ওঁরাও-ভূমিজ-মুণ্ডা-সাঁওতাল প্রভৃতি জনজাতি মানুষদের বিহার-রাঁচী-ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়। তাছাড়া জমিদারী শাসনব্যবস্থার শেষের দিকে মেদিনীপুর থেকে প্রচুর মানুষ এখানে এসে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে হাত লাগায়। নিয়ম ছিল, যে যতটা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করবে, জমি তার দখলে থাকবে আর তার বিনিময়ে জমিদারকে খাজনা দিতে হবে। এমনি করে সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে 'ঘেরি'-র সূত্রপাত হয়। 'ঘেরি' অর্থাৎ সমুদ্রের জল যাতে জোয়ারের সময় জমিতে না ঢুকতে পারে তার জন্য জমির চার দিকে মাটির বাঁধ দিয়ে জমি ঘিরে রাখার ব্যবস্থা। আজও সুন্দরবনে গেলে জমিদারের নামের শেষে 'ঘেরি' শব্দটি ব্যবহার করে বিভিন্ন অঞ্চলের নাম শুনতে পাওয়া যাবে।

২. সুন্দরবন অঞ্চলের বৃত্তিগত জনবৈচিত্র্য ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়:

সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে Household Industry Workers, Marginal Workers, Cultivators, Agricultural Laborers প্রভৃতি পেশার লোক দেখতে পাওয়া যায়। এখানে Household Industry Workers বলতে বোঝায়- Production, Processing, Servicing, Repairing, Making, Selling শ্রেণির কাজের মানুষ। আবার Marginal Workers বলতে বোঝায় যারা বছরে ৬ মাসের কম কাজ করে পায়। Main Workers হল তারা যারা বছরে ৬ মাসের বেশি কাজ করে। তারাই Agricultural Labors যারা কোন কৃষি খামারে দিন মজুরি হিসাবে কাজ করে। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে Main Workers তুলনায় অন্য শ্রেণির কর্মীর সংখ্যা বেশি। সুন্দরবনের শহর কেন্দ্রিক অঞ্চলগুলিকে বাদ দিলে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আজও তেমন উন্নত পরিকাঠামো গড়ে ওঠে নি। নেই স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, ফলে সরকারি কর্মীর সংখ্যা খুব কম। এখানে যে সকল পেশার মানুষ দেখা যায় তারা হল- মৌলে, জেলে, মাঝি, পাখি শিকারী, বাউলে, কাঁকড়াজীবী, মীন শিকারী, ডোঙাড়ে, বাঁধালি, ব্যাঙ শিকারী, শিউলি, মোয়া ও পাটালি প্রস্তুত কারক, দেওয়ালি ও কোদালি, ঘরামি, মাটিকাটা, গুণিন-ওঝা-বৈদ্য, কুলগুরু ও পুরোহিত, পাল্কিবাহক, গাজন গান ও পাঁচালি গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী ও বাদ্যকার, ডিম ব্যাপারী, ছাগল ভেড়া ও গরু ব্যাপারী, চর্মজীবী, ফেরিওয়ালা, দর্জি ও জরি শিল্পী, চাষি-শ্রমিক, কাঠুরিয়া, কুমোর, শালুক সংগ্রহকারী, বিভিন্ন প্রকার মাদুর প্রস্তুত কারক, পাখা শিল্পী প্রভৃতি পেশার লোক দেখতে পাওয়া যায়। ফলে এই সকল পেশার নাম শুনে বোঝাই যায় যে এ-স্থানে যারা বসবাস করে তার খুব একটা আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে থাকে না। এ-প্রসঙ্গে 'সমকালের জিয়নকাঠি' পত্রিকাতে মালবিকা গোস্বামী সুন্দরবন সম্পর্কে যে আর্থ-সামাজিক তথ্য দিয়েছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ মাছ ধরা পেশার সঙ্গে যুক্ত। এখানে শতকরা ৯৪.৬২ টি পরিবার কৃষিকাজ করে। এদের মধ্যে ৫০ শতাংশ লোকেরই আবার জমি নেই। এছাড়া ৫.৩৯ শতাংশ পরিবার মাছ ধরা, কাঠ কাটা, মোম মধু সংগ্রহ করা প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত।[১] তবে সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের কে মৎস্যজীবী হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এই কাঁকড়াজীবীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৩. কাঁকড়া ধরার পূর্বপ্রস্তুতি:

সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের কাঁকড়া ধরতে যাবার পূর্বে বেশ কিছু বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। যেমন কাঁকড়া ধরবার জন্য যে 'চার' (কাঁকড়ার খাবার) প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা, সেই সঙ্গে যারা দূরে কাঁকড়া ধরতে যায় তাদের নদীতে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সংগ্রহ করতে হয়; তাই সে বিষয়ে তারা পূর্বে থেকেই সতর্ক থাকে। যারা বাইরের জঙ্গলে অর্থাৎ অনেক দূরের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যায় তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় 'চাপান' বলে। এই চাপানে যারা যায় তারা সাধারণত ১০-১২ দিনের খাবার-সামগ্রী সঙ্গে করে নিয়ে যায়; কারণ বাইরের নদীতে কোনকিছু পাওয়া যায় না। এরা আগের দিন থেকেই নিরামিষ খাবার খায় এবং অনেক কিছুই মান্য করে চলে। এই চাপানের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী কেনার জন্য যে অর্থের

প্রয়োজন হয় তা আসে স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে। মহাজনেরা কাঁকড়া শিকারীদের চাপানে যেতে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, বিনিময়ে চাপান থেকে ফিরে এসে কাঁকড়া শিকারীরা প্রাপ্ত কাঁকড়া ঐ মহাজন কে দিতে বাধ্য থাকে। এইভাবে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার পূর্বে কাঁকড়া শিকারীদের সাথে স্থানীয় মহাজনদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। দূরে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার জন্য খাদ্য-সামগ্রীর পাশাপাশি খাবার জল, প্রয়োজনীয় ঔষধ, রান্নার জন্য জালানি, কাঁকড়া ধরার চার, প্রচুর পরিমাণে নুন যা তারা কাঁকড়ার চার সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করে। যারা চাপানে যায় না তারা সাধারণত স্থানীয় নদীতে কাঁকড়া ধরে। তবে এদের তেমন কোন বাদ বিচার নেই। সাধারণত কাঁকড়ার চার হিসেবে সোনা ব্যাঙ ব্যবহার করে, কখনো কখনো মাছের চারও ব্যবহার করতে দেখা যায়। যারা ব্যাঙের চার ব্যবহার করে তারা সাধারণত রাতে পুকুরের পার বা জলাশয়ের ধার থেকে ব্যাঙ শিকার করে এবং সেগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে নেয়। যারা গর্ত খুড়ে কাঁকড়া ধরে তাদেরও আবার অনেক কিছু মানতে হয়। এরাও মহাজনদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকে। এদেরও কাঁকড়া ধরার জন্য ৮-১০ দিন জঙ্গলে থাকতে হয় ফলে প্রচুর জিনিস-পত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। তবে এরা কাঁকড়া ধরবার জন্য কোন চার ব্যবহার করে না ফলে খরচ কিছুটা কম হয়। 'দন' দিয়ে যারা কাঁকড়া ধরার জন্য চাপানে যায় তারা দশমী অথবা একাদশীর দিন সমস্ত উপকরণ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর যারা গর্তখুড়ে কাঁকড়া ধরে তারা চতুর্থী বা পঞ্চমীর দিন কাঁকড়া ধরার জন্য জঙ্গলে যায়; যারা স্থানীয় নদীতে কাঁকরা ধরে তারা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দু'দিন আগে থেকে নদীতে জোয়ার হওয়ার সময় কাঁকড়া ধরতে যায়। এদের তেমন খরচ হয় না অনুরূপভাবে আয়ের পরিমাণটাও খুব কম।

৪. কাঁকড়া ধরার দেশীয় পদ্ধতি:

সুন্দরবন অঞ্চলে প্রধানত তিন ধরনের পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরা হয় যেমন, **দন পদ্ধতি, থবগা সুত পদ্ধতি, গর্ততাড়া পদ্ধতি**। এদের মধ্যে থবগা সুত ও দন পদ্ধতিতে কোটালের (অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) সময় জোয়ারের জলে কাঁকড়া ধরা হয়। গর্ততাড়া পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ আলাদা। 'মরানী' অর্থাৎ যখন জোয়ারের জল নদী উপকূলে কম ওঠে তখন এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে শুধু দন পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরে এমন মৎস্যজীবীর সংখ্যা খুব কম। কারণ হিসেবে বলা যায় দন পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরতে হলে নিজস্ব নৌকোর প্রয়োজন হয় -যা সবার নেই, আবার চাপানে যাওয়ার জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন তাও সবাই সংগ্রহ করতে পারে না। তাছাড়া যারা কেবল দন পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরে তারা জীবনের ঝুঁকি নিতে চায় না, এরা প্রত্যেক কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কোন না কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। তাই এরা সাধারণত নদীতে নামে না নৌকোতে বসেই কাঁকড়া ধরে। থবগা সুত পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরে এমন লোকের সংখ্যা সব থেকে বেশি। এই পদ্ধতিতে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের বাড়ি সাধারণত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে হয়। এরা জোয়ারের সময় নদীতে গিয়ে কাঁকড়া ধরে আবার ভাটায় বাড়ি ফিরে আসে ফলে এই ধরনের কাঁকড়াজীবীর সংখ্যা খুব বেশি। গর্ততাড়া পদ্ধতিতে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের পরিমাণটাও খুব কম। গর্ততাঁড়া পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরা খুবই দুঃসাহসিক কাজ যে কোন সময়ে এরা বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে তাই এই পদ্ধতিতে খুব বেশি কাঁকড়া ধরা হয় না। অন্যদিকে যারা দন নিয়ে কাঁকড়া ধরতে যায় তারা শুধু দনের ওপর নির্ভর করে না, সঙ্গে থবগা সুতও নিয়ে যায়। কারণ অনেক সময় দনের তুলনায় থবগাসুতে অনেক বেশি ও বড় কাঁকড়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরার লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। দন, থবগাসুত ও গর্ততাড়া -এই তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের সংখ্যাও কম নয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কাঁকড়া ধরায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠীর যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নে ছকের সাহায্যে উল্লেখ করা হল:

দন	থবগা সুত	গর্ততাঁড়া	দন ও থবগা সুত	সবকিছু
৩	১৭	৫	১৫	১০

সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা কার্য করে কাঁকড়া ধরে এমন মোট ৫০ জন ব্যক্তির কাছ থেকে যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে দেখা যায় দনের সাহায্যে কাঁকড়া ধরে ৩ জন, থবগাসুতের সাহায্যে ১৭ জন, গর্ততাঁড়ে ৫ জন, দন ও থবগা সুত ব্যবহার করে ১৫ জন এবং সব কিছুর সাহায্যে কাঁকড়া ধরে এমন লোকের সংখ্যা ১০ জন। বিষয়টি একটি চার্টের সাহায্যে তুলে ধরলে তা এই রূপ দাঁড়ায়:

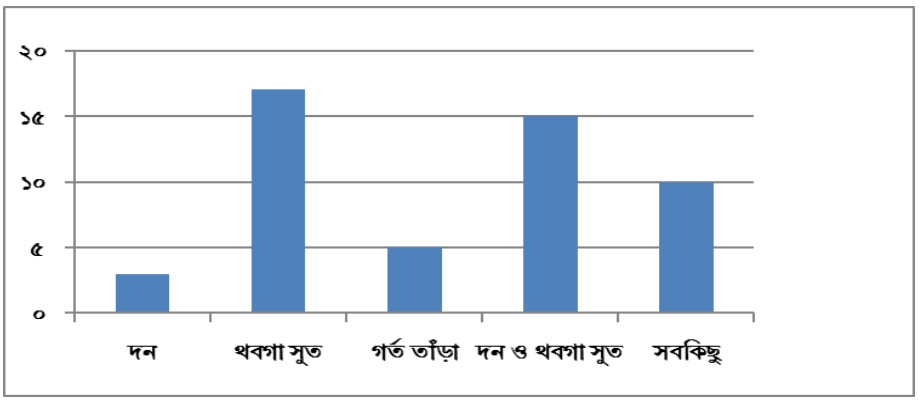

এবারে আসা যাক কাঁকড়া ধরার পদ্ধতিগত বিষয়ের দিকে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে কাঁকড়া ধরার এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

৪.১ দন পদ্ধতি:

সুন্দরবন অঞ্চলে কাঁকড়া ধরার ক্ষেত্রে দন পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। আসলে দন হল একটা লম্বা দড়ি, যা সাধারণত ৫০০-৭০০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এই লম্বা দড়িটি মোটা লাইলন বা টায়ারের সুতোর হয়। এই দড়ির এক প্রান্তে একটি আলাদা দড়ি দিয়ে একটি ভাসমান বস্তু বেঁধে রাখে যাকে এরা 'জাগি' (চিত্র নং-১) বলে। এই জাগি একটি চিহ্ন হিসেবে কাজ করে, এটা দেখে সবাই বুঝতে পারে যে এখানে কেউ দন ফেলেছে ফলে ওখানে আর কেউ দন ফেলবে না। জাগির অপর প্রান্তের মূল দড়ির (চিত্র নং- ২) সঙ্গে একটি আস্ত ইঁট বেঁধে দেয় যা দনকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আটকে রাখতে সাহায্য করে। ঐ ইঁটের ভারের জন্য জোয়ারের বা ভাটার টানে দন অন্য কোথাও সরে যায় না। এবার মূল দড়িতে দু'হাত অন্তর প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা আলাদা দড়ি বেঁধে দেয় যার অপর প্রান্তে একটি ফাঁস করে দেয় যেখানে পরবর্তী সময়ে চার বাঁধা হবে। এইভাবে মূল দড়িটার সঙ্গে ছোট ছোট দড়ি বাঁধা হয় এই ছোট ছোট দড়িকে ওরা গুচি (চিত্র নং- ৩) বলে। মূল দড়ির সঙ্গে প্রায় ৭০০-৮০০ টি গুচি বাঁধা হয় এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট ইটের টুকরো বেঁধে দেওয়া হয়। মূল দড়ির অপর প্রান্তেও অনুরূপভাবে একটি জাগি ও একটি ইঁট বাঁধা হয়। এছাড়া একটি বর দড়ি বেঁধে রাখা হয় যা দন ফেলার পরে নৌকার সঙ্গে দনের সংযোগ সাধন করে।

চিত্র নং- ১ জাগি

চিত্র নং- ২ দনের মূল দড়ি

চিত্র নং- ৩ গুচি

চিত্র নং- ৪ কাঁকড়া ধরবার চার

দন পদ্ধতিতে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই নৌকা রয়েছে। নিজস্ব নৌকা ছাড়া এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরা সম্ভব নয়। সাধারণত দশমী বা একাদশীর দিন কাঁকড়া ধরার জন্য বেরোতে হয়। খাবার সামগ্রী, ১০-১৩ কেজি নুন, ৮-১০ কেজি চার, দন, কাঁকড়া রাখার পাত্র, খ্যাবলা জাল প্রভৃতি জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে সকাল বেলা নৌকোয় পুজো দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যেদিন তারা নদীতে যায় সেদিন কাঁকড়া ধরে না, ঐ দিন রাত থেকে কাঁকড়া ধরার প্রস্তুতি নিতে থাকে। নদীতে যারা ক্রমাগত কাঁকড়া ধরতে যায় তারা জানে কোন স্থানে বেশি কাঁকড়া ধরা পড়তে পারে, সেই মত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায়। আবার কখন কখন নতুন স্থানেরও খোঁজ করে। তবে সে ক্ষেত্রে তারা মূল নদী থেকে কিছুটা ভিতরের দিকে চলে যায়। এইভাবে যেতে যেতে যদি নদী পাড়ে প্রচুর গর্ত দেখে তবে তারা সেখানে দন ফেলার পরিকল্পনা করে। যেখানে প্রচুর গর্ত থাকে সেখানে বেশি কাঁকড়া ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কাঁকড়া ধরার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেলে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা চারগুলিকে (চিত্র নং- ৪) ছোট ছোট টুকরো করে কাটে। এক কেজি চারকে ৫০-৬০ টি টুকরো করা যায়। এই চার কামট মাছ বা বেড়ো (সাপের মতো দেখতে এক ধরনের সামুদ্রিক মাছ) অথবা ট্যাংরা মাছের হয়। তবে কামট মাছের চারে বেশি কাঁকড়া পড়ে কারণ ঐ মাছ দেখতে সাদা রঙের, যা কাঁকড়া সহজে দেখতে পায় আবার মাছটা নরম হওয়ার জন্য তা কাঁকড়ার প্রিয় খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। দনের গুচি অনুযায়ী চার কাটা হয়ে গেলে তা দনের গুচিতে বেঁধে ফেলা হয়। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে পরের দিন সকালের জোয়ার লাগার সঙ্গে সঙ্গে জাগি ফেলে জোয়ারের অভিমুখে দন ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যায়। দনের শেষ মাথায় গিয়ে শেষ জাগিটা ফেলে দেওয়া হয়। ১০-১২মিনিট এ-ভাবে অপেক্ষা করার পর দন তোলার সময় হয়। বেশি দেরি হয়ে গেলে আবার কাঁকড়াই চার কেটে নেয়। দনের শেষ মাথায় যে আলাদা একটি দড়ি লাগানো থাকে তা নৌকার সঙ্গে বাঁধা থাকে। দন ফেলার দশ মিনিট পরে নৌকার সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে জাগি তোলা হয়। যখন জোয়ারের অভিমুখে দন ফেলা হয় তখন তা খুব তাড়া তাড়ি হয় কিন্তু দন তোলার সময় তাড়াহুড়ো করা যায় না। তাড়াহুড়ো করলে কাঁকড়া চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ফলে জোয়ারের উল্টোদিক দিয়েই ধীরে ধীরে দন তুলতে হয়। নৌকোয় একজন হাল ধরে নৌকোর গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণ করে আর এক জন নীচু হয়ে দনের মূল দড়ি ধরে ধীরে ধীরে দন তুলতে থাকে তবে দন সবাই তুলতে পারে না। খুব অভিজ্ঞ লোক হলে তবে দন তুলতে পারবে তা না হলে কাঁকড়া সব চলে যাবে। যে দন তোলে তার কাছে খ্যাবলা জাল টি থাকে। মূল দড়ি ধরে যখন দন তোলা হয় তখন গুচিতে বাঁধা চারে কাঁকড়া থাকলে কাঁকড়া উল্টো দিক দিয়ে চার টেনে নিতে চেষ্টা করে ফলে যে দন তোলে সে বুঝতে পারে সামনের গুচিতে কাঁকড়া রয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে খ্যাবলা জালটি হাতে নিয়ে নেয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে গুচি বাঁধার জন্য যে দন তোলে সে বুঝতে পারে কাঁকড়া জলের কতটা নীচে রয়েছে। সেই মত হাতের কাছে কাঁকড়া এলে এক হাতে দন ধরে অন্য হাতে খ্যাবলা জালটি জলের নীচ দিয়ে গলিয়ে দেয় আর কাঁকড়া ঐ খ্যাবলা জালের মধ্যে আটকা পড়ে। পাশে রাখা হাড়িতে খ্যাবলা জালটি উপুড় করে দিলেই কাঁকড়া হাড়ির মধ্যে গিয়ে পড়ে। এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত দনটা তুলে ফেলা হয়। কাঁকড়া ধরার ক্ষেত্রে যে দন তোলে তাঁর যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে তেমনি যে নৌকার হাল ধরে তার গুরুত্বও কম নয়। কখন কিভাবে নৌকো চালাতে হবে তা মাঝির ওপরেই নির্ভর করে। নৌকো এগোনোর সাথেই দন তোলা ও কাঁকড়া ধরার সুবিধা অসুবিধা নির্ভরশীল। ফলে যে দন তোলে আর যে নৌকো চালায় তাদের দুজনের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দু'জনে এক হলেই তবে কাঁকড়া ঠিকঠাক ধরা যাবে। সম্পূর্ণ দন তোলা হয়ে গেলে নৌকা আবার জোয়ারের অভিমুখে নিয়ে যায়। পূর্বে যেখানে দন ফেলা শেষ হয়েছিল সেখান থেকে আবার অনুরূপভাবে দন ফেলা ও তোলা হয়। এইভাবে যতক্ষণ নদীতে জোয়ার থাকে তাতে ৫-৬ বার দন ফেলা সম্ভব হয়। সাধারণত জোয়ারের সময় এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরে। স্থান বিশেষে কখন কখন দনে খুব কাঁকড়া পড়লে তবেই ভাটার সময় দন ফেলা হয় কিন্তু ভাটার সময় খুব একটা কাঁকড়া পড়ে না। এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরতে হলে নৌকোতে ২-৩ জন লোকের প্রয়োজন হয়। দু'জনকে সম্পূর্ণভাবে কাঁকড়া ধরার কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। অপর ব্যক্তি ঐ সময় খাবার তৈরি করা, কাঁকড়া বাঁধা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করা প্রভৃতি কাজগুলি করে থাকে। দিনে বেলায় যারা দন ফেলে

কাঁকড়া ধরে তারা আবার রাতে কাঁকড়া ধরে না। দিনের বেলা কাঁকড়া ধরা হয়ে গেলে দনটি তুলে একটি ঝুড়ির মধ্যে গুছিয়ে রাখে এবং দনের গুচি থেকে চারগুলি খুলে তা একটা পাত্রের মধ্যে নুন চাপা দিয়ে রাখে। নুন দিয়ে না রাখলে চারগুলি নষ্ট হয়ে গন্ধ হয়ে যায়, চারে গন্ধ হলে কাঁকড়া ঐ চার খায় না। এই পদ্ধতিকে এরা নুন টানা বলে। প্রতিদিন কাঁকড়া ধরার পরে এই কাজটি এদের করতে হয়। আবার খেয়াল রাখতে হয় চারের গুণাগুণের দিকে, যদি চার লাল হয়ে যায় তবে তাতে কাঁকড়া কম পড়ে তখন চার পরিবর্তন করে দিতে হয়। সাধারণত একবার চার লাগালে তাতে দু'দিন চলে। সমস্ত কাজকর্ম হয়ে গেলে রান্না, খাওয়াদাওয়া হয়। পরের দিন আবার জোয়ার আসার আগেই গুচিতে চার লাগিয়ে ফেলে, ফলে যে ক'দিন নদীতে কাঁকড়া ধরার গোন থাকে সে ক'দিন এদের যেমন খুব ব্যস্ত থাকতে হয় তেমনি খুব পরিশ্রমও হয়। কোটালে ৫-৭ দিন কাঁকড়া ধরার গোন থাকে। কাঁকড়া ধরা হয়ে গেলে জঙ্গলের কোন একটি গাছের গোড়ার লতা-পাতা পরিষ্কার করে সেখানে মায়ের উদ্দেশ্যে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

৪.২ থবগাসুত পদ্ধতি:

সাধারণত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যারা বসবাস করে তারা এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরে। কখন কখন আবার যারা দন ফেলে তাদেরকেও থবগাসুত ফেলতে দেখা যায়। কাঁকড়া ধরার ক্ষেত্রে এটি খুবই সহজতম পদ্ধতি। থবগাসুত তৈরি করার জন্য বেশ কয়েকটি উপকরণের প্রয়োজন যেমন- ৬-৭ ফুট লম্বা লাঠি, ১০-১২ ফুট সরু দড়ি (চিত্র নং-৯), ছোট ছোট ইট বা পোড়া মাটির টুকরো, চার ইত্যাদি। এই উপকরণগুলি সংগ্রহ হয়ে গেলে, প্রথমে লম্বা লাঠির গোড়ার দিকটা সুচালো করে নিতে হয়। লাঠির মাথার দিকটাতে ঐ সরু দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হয় এবং অপর প্রান্তের শেষে ৬-৭ ইঞ্চির মত দড়ি বাদ রেখে একটি ইঁট বা পোড়া মাটির টুকরো বেঁধে দেওয়া হয় (চিত্র নং-৮)। শেষ মাথায় একটি ফাঁস করে সেখানে মাছ অথবা ব্যাঙের চার বেঁধে নিলেই একটি উত্তম থবগা সুত তৈরি হয়ে যাবে (চিত্র নং-১০)।

চিত্র নং- ৫ ব্যাঙ ধরার বড়শি

চিত্র নং- ৬ ব্যাঙ ধরার পদ্ধতি

চিত্র নং- ৭ ব্যাঙের চার

চিত্র নং-৮ চার বাঁধার নিয়ম

এই পদ্ধতিতে যারা কাঁকড়া ধরে তারা ১৫-২০ টি থবগাসুত সঙ্গে নেয় (চিত্র নং- ১১)। এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরার জন্য খুব বেশি চারের প্রয়োজন হয় না। যারা চার কেনে না, তাঁরা চার হিসেবে পুকুরের মাছ অথবা ব্যাঙ ব্যবহার করে। তবে এই ব্যাঙ ধরার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণত রাতের বেলায় পুকুর পাড়ে বা জলাশয়ের ধারে সোনা ব্যাঙ থাকে হাতে বানানো কোচ বা বর্ষা দিয়ে ঐ ব্যাঙ ধরা হয়। আবার অন্য আর একটি পদ্ধতিতেও ব্যাঙ ধরতে দেখা যায়। প্রথমে তিনটি বড় বড়শি একত্র করে একটি ছোট সুতো দিয়ে বেঁধে নেয়, যাতে বড়শি তিনটির মুখ তিন দিকে থাকে (চিত্র নং- ৫)। এবার একটি লম্বা মোটা সুতোর মাঝখানে বড়শি বাঁধা সুতোটিকে বেঁধে দেয়, এমন করে বাঁধে যাতে বড়শি বাঁধা সুতোটি বেশ খানিকটা ঝুলে থাকে। পুকুরে বা জলাশয়ের কোথাও ব্যাঙ ভেসে থাকতে দেখলে পুকুরের পাড় ধরে দু'দিকে দুজন এগিয়ে যায়। বড়শি ব্যাঙ বারবার এলে ধীরে ধীরে বড়শিকে ব্যাঙের গায়ে নামিয়ে দেয়। এর পর একজন সুতো একটু হালকা করে আর একজন খুব জোরে টান দেয়

(চিত্র নং- ৬)। ব্যাঙের গায়ে লেগে থাকা বড়শি প্রচণ্ড টানে ব্যাঙের গায়ে গেথে যায় এবং ব্যাঙ উপরে উঠে আসে। পর্যাপ্ত ব্যাঙ ধরা হয়ে গেলে সেগুলোকে কেটে ছোট ছোট টুকরো করে নেয় (চিত্র নং- ৭)। চার বাঁধা থবগাসুত নিয়ে জোয়ার শুরুর পূর্বেই নদীতে চলে যায়। যেখানে কাঁকড়া ধরা হবে সেখানে এক হাঁটু জলে প্রায় ২০-২৫ হাত অন্তর অন্তর থবগাগুলির মাথায় সুতোয় বাঁধা চার নদীর গভীরে ছুড়ে দিয়ে লাঠিটাকে শক্ত করে মাটিতে পুঁতে দেয়। সমস্ত থবগা ফেলা হয়ে গেলে হাতে খ্যাবলা জাল নিয়ে অপেক্ষা করে। জোয়ারের অভিমুখে জলের টানে থবগার সুতো টান টান হয়ে থাকে। যদি কোন কারণে কোন থবগার সুতো টান না হয়ে ঢিলা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ থবগাতে কাঁকড়া রয়েছে। এছাড়া থবগার সুতোর যদি অস্বাভাবিক টান থাকে তাহলেও কাঁকড়া রয়েছে বুঝতে হবে। থবগায় কাঁকড়া রয়েছে বুঝতে পারলে ডান হাতে খ্যাবলা জাল নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এবং বাম হাতে থবগার সুতো তর্জনী ও কনিষ্ঠার মাধ্যমে টানতে থাকে। সুতোয় বাঁধা ইঁটের টুকরো যখনই দেখতে পায় তখনই ডান হাতের খ্যাবলা জালটি কাঁকড়ার সোজাসুজি জলের নিচ গলিয়ে দেয় (চিত্র নং- ১২) আর সাথে সাথে কাঁকড়া ঐ খ্যাবলা জালে আটকা পড়ে। জোয়ারের জল যত বৃদ্ধি পায়, থবগা গুলোকে ততই টেনে টেনে উপরের দিকে তুলতে হয়। এইভাবে পর পর দন তুলে তুলে কাঁকড়া ধরা চলতে থাকে যতক্ষণ জোয়ার থাকে ততক্ষণ কাঁকড়া ধরা হয়। ভাটা শুরু হলে আর কাঁকড়া ধরা পড়ে না, কাঁকড়া সব গর্তে ঢুকে যায়। এই পদ্ধতিতেও অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় ৫-৭ দিন কাঁকড়া ধরা হয়। তুলনামূলকভাবে এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া কম ধরা পড়ে।

চিত্র নং-৯ খুলে ফেলা থবগাসুত

চিত্র নং-১০ সম্পূর্ণ থবগাসুত

চিত্র নং- ১১ নৌকায় থবগাসুত

চিত্র নং- ১২ থবগায় কাঁকড়া ধরা

৪.৩ গর্ততাঁড়া পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিটি একটু আলাদা ধরনের। সাধারণত শীতের সময় এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরা হয়। কারণ শীতের সময় ঠাণ্ডা লাগায় কাঁকড়া গর্ত থেকে বের হতে চায় না। তবে এই পদ্ধতিতে যাঁরা কাঁকড়া ধরে তাঁরা সব থেকে বেশি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। শীতে কাঁকড়া গর্ত থেকে না বেরোনোর জন্য দন বা থবগা সুত বিশেষ কার্যকরী হয় না। তখন বাধ্য হয়েই কাঁকড়া ধরার জন্য এই পদ্ধতির অবলম্বন করতে হয়। এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরতে হলে বেশ কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন যেমন, ভালি, কোদাল, কাঠের হাতলযুক্ত লোহার শিক, লেচিদড়ি (চিত্র নং- ১৪), দড়ি কাটার মতো ধারালো যন্ত্র, বড় ব্যাগ, ইত্যাদি। এই জিনিসগুলি হলেই কাঁকড়া ধরা যায়। ভালি যন্ত্রটি একটু আলাদা, একটি গোল লম্বা কাঠের দণ্ডের মাথায় প্রায় ছ'ইঞ্চি চওড়া লোহার ফলা লাগানো থাকে। সব মিলিয়ে এটি প্রায় ৪.৫-৫ ফুট লম্বা হয় (চিত্র নং- ১৩)। এই যন্ত্রটি ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে কাঁকড়া ধরা প্রায় অসম্ভব। এই পদ্ধতিতে যারা কাঁকড়া ধরে তারা সংঘবদ্ধ হয়েই জঙ্গলে যায় কারণ এতে সব থেকে বেশি জীবনের ঝুঁকি থাকে। প্রথমে এরা একটি গ্রুপ বা গোষ্ঠী করে নেয় তারপর জাগ্রত কোন বনবিবির থান থেকে আদেশ কাটায়। আগে থেকেই মহাজনদের সঙ্গে চুক্তি থাকে যে, কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার জন্য চালানবাবদ যত টাকা প্রয়োজন তা মহাজন দেবে। সেই সঙ্গে এও চুক্তি থাকে চাপান (কাঁকড়া ধরতে যাওয়া) থেকে ফিরে সমস্ত কাঁকড়া ঐ মহাজনকে দিতে বাধ্য থাকবে। পরিকল্পনানুযায়ী সমস্ত আয়োজন হয়ে গেলে তিথি, গোন দেখে তবে কাঁকড়া ধরতে বের হয়। এই পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরতে হলে পঞ্চমীর দিন বের হতে হয়। পঞ্চমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত কাঁকড়া ধরা যায় কারণ এই সময় জোয়ারের জলে নদী-উপকূলে কম ওঠে। এই পদ্ধতিতে যারা কাঁকড়া ধরে তারা দলে প্রায় ১০-১২ জন লোক

থাকে। প্রথমে কোথায় কাঁকড়া ধরবে তা ঠিক করে। এক্ষেত্রে তারা যেখানে বেশি পরিমাণে গর্ত দেখে সেই স্থানকেই নির্ধারণ করে তবে যত গভীর জঙ্গলে যাওয়া যাবে তত কাঁকড়া বেশি পাওয়া যাবে। সেই মত জোয়ারের সময় ছোট নদী ধরে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে। অবশেষে যেখানে নৌকা আর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না সেখানে নৌকা রাখার ব্যবস্থা করে। এদিকে মরানী (অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝামাঝি সময় যখন জোয়ারের জল কম ওঠে) পড়ে যাওয়ায় ৬-৭ দিন নৌকার কাছাকাছি জোয়ারের জল আর আসে না ফলে ঐ স্থানটি তাদের প্রতিদিনের ফিরে আসার ঠিকানা হয়। নৌকাতে ৬-৭ দিনের খাবার সামগ্রী মজুত থাকে। একজন থাকে যে নৌকা ছেড়ে কোথাও যায় না। তাঁর ওপরেই নৌকোর দায়িত্ব থাকে সে সবার জন্য খাবার প্রস্তুত করে। কাঁকড়া ধরতে যারা ওপরে ওঠে তারা সকাল বেলা কিছু খেয়ে নেয়। তার পর শুরু হয় কাঁকড়া ধরা। সবার কাছেই একটা বড় ব্যাগ, ভালি, লোহার শিক, কাঁকড়া বাঁধার সুতো, সুতো কাটার জন্য ব্লেড বা ছুরি প্রভৃতি জিনিস থাকে। কাঁকড়ার গর্ত দেখলেই গর্ত খোঁড়া যায় না। প্রথমে দেখে নেয় গর্তের আশেপাশে কাঁকড়ার পায়ের ছাপ রয়েছে কিনা, যদি কাঁকড়ার পায়ের দাগ থাকে তবে বুঝতে পারে ঐ গর্তে কাঁকড়া রয়েছে। তখন ভালি দিয়ে গর্তের মুখ কিছুটা পরিষ্কার করে গর্ত করে নেয়। এর পর এক মাথা সামান্য বাঁকানো লোহার শিক ঐ গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোরাতে থাকে। যদি কাঁকড়া থাকে তবে তৎক্ষনাৎ ঐ শিক কাঁকড়ায় কামড়িয়ে ধরে তখন শিকটাকে একটু ঘুরিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে কাঁকড়ায় গায়ে আটকিয়ে উপরের দিকে টেনে তোলে। কাঁকড়া উপরে উঠে এলে সাথে সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয় (চিত্র নং- ১৫)। এইভাবে পরপর গর্ত খুঁজে কাঁকড়া ধরতে থাকে।

চিত্র নং- ১৩ ভালি ও বাঁকানো শিক

চিত্র নং- ১৪ কাঁকড়া বাঁধার দড়ি

চিত্র নং- ১৫ কাঁকড়া বাঁধারত মহিলা

তবে বেশিক্ষণ কাঁকড়া ধরা যায় না কারণ বেলা পড়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসে। তাই সময় বুঝে গন্তব্য স্থলে ফিরে আসতে হয়। নৌকাতে যে থাকে সে সবার জন্য রান্না করে রাখে। সন্ধ্যার মধ্যে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে, সারা দিনের পরিশ্রমের ফলে তাড়াতাড়ি সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। এইভাবে কাঁকড়া ধরা চলতে থাকে। সারাদিন যা কাঁকড়া পাওয়া যায় তা ঐ নৌকাতেই সঞ্চয় করা হয়। ওদিকে মরানী শেষ হয়ে আবার অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় হয়ে ওঠে ফলে জোয়ারের জল বাড়তে থাকে। দ্বাদশী বা ত্রয়োদশীর সময় যেখানে তারা নৌকা রেখেছিল সেখানে জোয়ার জল উঠে আসে তখন বাড়ি ফেরার সময় হয়। জঙ্গলের কোন একটা স্থানে কিছুটা পরিষ্কার করে সেখানে বনবিবির উদ্দেশ্যে পুজো দিয়ে নৌকা নিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসে।

৫. কাঁকড়া ধরার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন:

গভীর জঙ্গলে যেখানে মানুষের আনাগোনা খুব একটা হয় না, সেখানেই কাঁকড়া সব থেকে বেশি পাওয়া যায়। স্বভাবত যারা কাঁকড়া ধরে তারা গভীর জঙ্গলমুখী হয়। আবার বাঘ, বিষধর সাপ, মৌচাক প্রভৃতি জঙ্গলের গভীরে বসবাস করে। ফলে গভীর জঙ্গলেই বিপদের আশঙ্কাটা সবথেকে বেশি থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে আনন্দ পাওয়ার জন্য বা ভালবেসে কেউ কাঁকড়া ধরতে যায় না। কাঁকড়া ধরতে যারা যায় তারা প্রায় প্রত্যেকেই জীবিকার তাগিদে জঙ্গলে যায়, এদের জীবনহানির আশঙ্কা থাকে প্রতি পদে পদে। যারা দন ফেলে কাঁকড়া ধরে তারা কিছুটা হলেও নিরাপদে কাঁকড়া ধরে কিন্তু যারা থবগা সুত ও গর্ততাঁড়া পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরে তাদের জীবনহানির আশঙ্কা

থাকে সব থেকে বেশি। ফলে কাঁকড়া ধরার সাথে সাথে তাদের ভীষণভাবে সতর্ক থাকতে হয়। কাঁকড়া ধরার সময় তাদের যে সব বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হয় তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

- থবগা ফেলে কাঁকড়া ধরার সময় খুব একটা পিছনের দিকে নজর রাখা যায় না। কারণ থবগায় কাঁকড়া পড়লে জলের দিকে মুখ করে ধীরে ধীরে সুতো ধরে টানতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই কাঁকড়া চলে যায় তাই সে দিকে গভীর মনোযোগ রাখতে হয়। ওদিকে দীর্ঘক্ষণ একই জায়গাতে থাকার ফলে মানুষের গন্ধে বাঘ চলে আসে। বাঘ পিছন থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরেই কাঁকড়া ধরার ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যখনই সে নীচু হয়ে কাঁকড়া ধরে তখনই বাঘ পিছন থেকে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। তাই যারা কাঁকড়া ধরতে যায় তারা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর চতুর্দিকে একবার করে দেখে নেয়।

- শুধু বাঘ নয়, জলের কুমিরের দিকেও নজর রাখতে হয়। তবে কুমির সাধারণত: অনেক দূর থেকেই শিকার লক্ষ্য করে ডুব দিয়ে কাছে চলে আসে। তাই তারা জলেও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সেই সঙ্গে দূরের জলের দিকেও নজর রাখতে হয়।

- জলের ধার ধরে যখন অন্য থবগার দিকে এগিয়ে যেতে হয় তখন গাছের ও পায়ের দিকে নজর রাখতে হয়। কারণ গাছে অথবা মাটিতে বিষধর সাপ থাকতে পারে। জঙ্গলের সাপের বিষ অনেক তীব্র হয়। জঙ্গলে কাউকে সাপে কামড়ালে তাকে ফিরিয়ে এনে চিকিৎসা করানোর মত সময় থাকে না। তাই সে দিকেও তাদের লক্ষ্য রাখতে হয়।

চিত্র নং- ১ নদীর জলে বিষধর সাপ

- গর্ততাঁড়া পদ্ধতিতে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের জীবনের ঝুঁকি সব থেকে বেশি থাকে। কারণ জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গাছ, লতা পাতায় পরিপূর্ণ, প্রবেশ দু:সাধ্য স্থানে হেঁটে হেঁটে তাদের গর্ত খুঁজতে হয়। যখন গর্ত খোঁজে তখন বাঘও তাদের পিছু নেয়। বাঘের এই পিছু নেওয়াটা যদি বুঝতে না পারা যায় তবে বাঘ দল থেকে কাউকে না কাউকে নিয়ে যাবেই ফলে সে দিকে নজর রাখতে হয়।

- গর্তখুঁড়ে যারা কাঁকড়া ধরে তারা কাঁকড়া ধরার সঙ্গে সঙ্গে সুতো দিয়ে কাঁকড়া বেঁধে নেয়। যখন কাঁকড়া বাঁধে তখন সাবধানে কাজ করতে হয়, তা না হলে কাঁকড়া হাত থেকে ফসকে গেলে তা হাতে অথবা পায়ে কামড়ে ধরতে পারে। এইগুলি এমনই হয় যে, একবার কামড়ে ধরলে তা আর সহজে ছাড়ে না। বেশিক্ষণ কামড়ে ধরলে তা আবার হাত-পা কেটে দেয়। কাঁকড়া বাঁধার সময়ও সতর্ক থাকতে হয় যদি কাঁকড়ার মোটা দাঁড়াটি ভেঙ্গে যায় তবে তার উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না, অনেক সময় আবার তা মরেও যায়। তাই এ দিকেও নজর রাখতে হয়।

৬. কাঁকড়া ধরার কাজে নিযুক্ত জনগোষ্ঠী:

সুন্দরবন অঞ্চলে কাঁকড়া ধরা পেশাকে যারা জীবনের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে, তারা কঠোর পরিশ্রম করেই তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমস্যার মধ্যদিয়ে তাদের দিন গুজরান হয়। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চল উনিশটি ব্লক নিয়ে গঠিত। এই ব্লকগুলির সমস্ত স্থানের অধিবাসীরা কাঁকড়া ধরার কাজকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নি। যে সমস্ত স্থান নদীর তীরবর্তী স্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সে গ্রাম অথবা মফ:সল যাই হোক না কেন, সে স্থানের জনগোষ্ঠীর কাছে এই পেশা তেমন বিস্তারলাভ করে নি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে সব থেকে বেশি এই পেশার অন্তর্গত লোকেরা বসবাস করে। কারণ হিসেবে বলা যায় নদীর তীরবর্তী স্থানে বসবাস করার ফলে খুব সহজেই নদীতে গিয়ে কাঁকড়া ধরা যায়। অবার নদীর কাছাকাছি থাকার জন্য জোয়ার ও ভাটায় মাছ, কাঁকড়ার যোগান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান -উভয় ধর্মের

মানুষকে এই পেশায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে মুসলিমদের পরিমাণ খুব কম। ক্ষেত্রসমীক্ষায় এও দেখা গিয়েছে যারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত তারা সব থেকে বেশি গর্ততাঁড়া পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরে। কী কারণে তারা এই পদ্ধতি বেশি পছন্দ করে তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি।

৬.১ পেশাগত অনুসন্ধান:

সুন্দরবন অঞ্চলে অর্থ উপার্জনের একটি বড় মাধ্যম হল কৃষিকাজ। যারা কাঁকড়া ধরে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়, সে প্রসঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী এই কাঁকড়াজীবীদের চাষের জমি নেই বললেই চলে। অনেকের আবার বাস্তু জমিটুকুও নেই। যাদের জমি জায়গা কিছুই নেই তারা নদীর কূলে খাস জমিতে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে বসবাস করে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় Micro Study-র ফলে যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে দেখা যায় মোট ২৩ জন মানুষ যারা শুধু কাঁকড়া ধরে অন্য কোন পেশার সাথে যুক্ত থাকে না। আবার কাঁকড়া ধরে ও চাষও করে এমন লোকের সংখ্যা ১৪ জন। চাষ করার সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরা বা অন্য কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত এমন লোকের সংখ্যা ৭ জন। যারা চাষ করে না কিন্তু অন্য কোন পেশা যেমন, মধু সংগ্রহ করা বা মাছ ধরা প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে এমন লোকের সংখ্যা ৬ জন। তাহলে একনজরে বিষয়টি দাঁড়ায়:

শুধু কাঁকড়া ধরে	চাষের সঙ্গে যুক্ত	চাষ ও অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত	অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত
২৩	১৪	৭	৬

আসলে যে ২৩ জন ব্যক্তিকে শুধু কাঁকড়া ধরায় নিযুক্ত হতে দেখাগেল তারাই প্রকৃত কাঁকড়াজীবী। এদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব নৌকা রয়েছে নতুবা অন্য কারো নৌকাতে কাঁকড়া ধরতে যায়। আবার এমনও দেখা গিয়েছে বাধ্য হয়েই এরা শুধু কাঁকড়া ধরার কাজে নির্ভরশীল হয়েছে। আবার যাদের জায়গা জমি রয়েছে কিন্তু তা পরিমাণে খুব কম তারা কাঁকড়াও ধরে আবার চাষও করে। কাঁকড়া ধরার সঙ্গে সঙ্গে চাষও করে ও অন্যান্য নানাবিধ কাজ করে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। এরা আসলে পোশাকী কাঁকড়াজীবী। কাজ করতে ভালো না লাগলে তখন কাঁকড়া ধরতে যায়। আবার কাঁকড়া ধরতে ভালো না লাগলে কাজে যায়। কখনও কখনও নদীতে খুব কাঁকড়া পড়লে তখন কাজ ছেড়ে কাঁকড়া ধরতে আসে। কিন্তু ঐ ২৩ জন ব্যক্তি কখনই কাঁকড়া ধরা ছাড়া অন্য কোন পেশায় যুক্ত হয় না। আবার অন্য পেশায় যুক্ত যে কয়েকজন ব্যক্তিকে পাই, তারা সাধারণত মধু ধরার কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় বছরের এই তিন মাস নদীতে মাছ ধরা বারণ থাকে তখন আবার জঙ্গলে মধু কাটার সময় হয়। তাই ঐ ব্যক্তিরা তখন মধু সংগ্রহের কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। নিম্নে এই সম্পর্কিত একটি বারগ্রাফ তুলে ধরা হল:

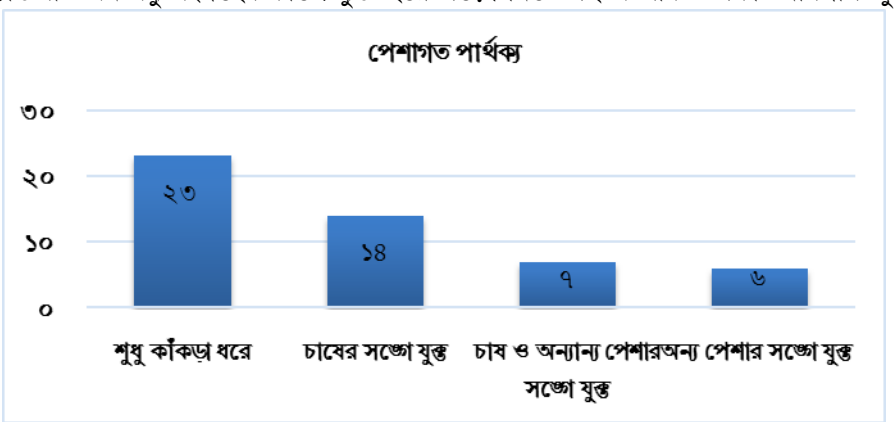

ক্ষেত্রসমীক্ষায় যে চার ধরনের কাঁকড়াজীবীকে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে গ্রাফটিতে দেখা যাচ্ছে শুধু কাঁকড়া ধরে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। আবার কাঁকড়া ধরার সাথে সাথে চাষের সঙ্গে যুক্ত এমন লোকের সংখ্যা কিছুটা কম। কিন্তু অন্য দুই ধরনের পেশায় অংশগ্রহণ কারী লোকের সংখ্যা প্রায় সমান। পরবর্তী পর্যায়ে এদের এই পেশায় অংশগ্রহণের সূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা কাঁকড়া ধরে তাদের মধ্যে গভীরভাবে ঐতিহ্যগত জ্ঞান রয়েছে। তাই এই ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সূত্র কোথায় তা খোঁজা খুবই জরুরি।

৬.২ বংশপরম্পরাগত পেশানুসন্ধান:

বর্তমানে যারা কাঁকড়া ধরছে তারা যে হঠাৎ করে কাঁকড়া ধরা পেশাকে তাদের অন্ন সংস্থানের মাধ্যম করেছে তা নয়। বংশ পরম্পরাগতভাবে বয়ে আসা এই পদ্ধতি এক দিনে কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও পর্যবেক্ষণের ফলে এই পদ্ধতি আয়ত্ত করা সম্ভব। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যারা বর্তমানে কাঁকড়া ধরছে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই পেশায় কর্মক্ষম হয়ে উঠেছে। অনেকে আবার পাশাপাশি থাকতে থাকতে এই পেশাগত পদ্ধতি আয়ত্ত করে ফেলেছে। বংশপরম্পরাগত পেশানুসন্ধান করতে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় যে তথ্য পাওয়া তা তুলে ধরা হল:

মাছ-কাঁকড়া ধরা	চাষের কাজ	উভয় কাজ	বিভিন্ন প্রকার কাজ
৩৮	১০	২	০

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যারা বর্তমানে কাঁকড়া ধরছে এমন ৩৮ জন ব্যক্তির পূর্বপুরুষেরা কাঁকড়া ধরা জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ফলে পূর্বপুরুষদের এই পেশা অতি সহজেই তাদের পরবর্তী প্রজন্মে প্রবেশ করেছে। আবার দেখা যাচ্ছে ১০ জন ব্যক্তি রয়েছে যাদের পূর্বপুরুষেরা কোনভাবেই কাঁকড়া ধরা জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল না, তারা চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আবার দু'জন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যারা উভয় কাজই করত অর্থাৎ কাঁকড়াও ধরত আবার চাষও করত। এই তথ্য থেকে যে গ্রাফ পাওয়া যায় তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

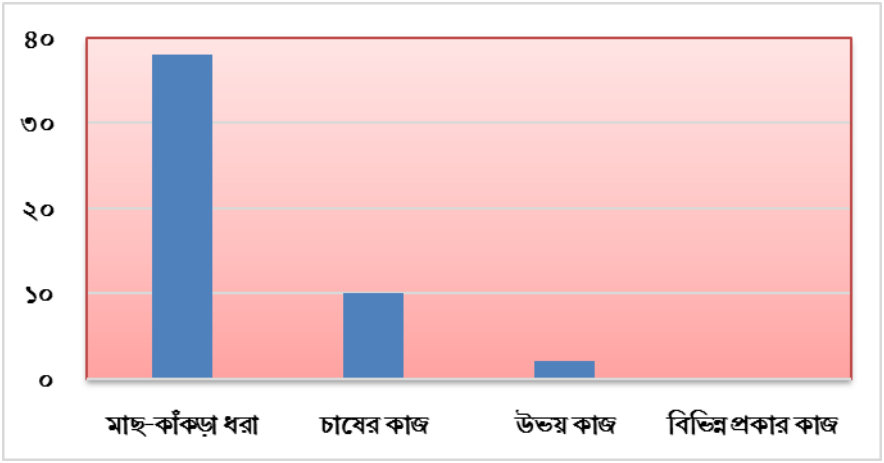

গ্রাফটিতে দেখা যাচ্ছে যারা বংশ পরম্পরাগতভাবে কাঁকড়া ধরা পেশাকে বেছে নিয়েছে তাদের পরিমাণ সব থেকে বেশি। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, সুন্দরবন অঞ্চল খুবই অনুন্নত ছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পিছিয়ে পড়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। নোনা পরিবেশে চাষবাস তেমন হতই না। তাই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য মাছ, কাঁকড়া ধরার পেশাই ছিল যথেষ্ট। যারা মাছ-কাঁকড়া ধরত, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষা-দীক্ষায় তেমন অগ্রসর হতে পারে নি। তাই শেষ পর্যন্ত কাঁকড়া ধরা পেশা তারা মেনে নিয়েছে। অপর দিকে যারা চাষবাস করত তাদের কোন কোন

পরিবারে অধিক সংখ্যক সন্তান হওয়ায় পরবর্তী সময়ে জমি জায়গার অংশ না পেয়ে নদীর তীরে পতিত জমিতে বসবাস শুরু করে। আবার কখন এমনও হয়েছে অভাবের তাড়নায় শেষ সম্বল জমি বিক্রি করে দিয়ে নদীর তীরে বাস করতে শুরু করেছে। এই ধরনের ভূমি হীনরা, যারা বা যাদের পূর্বপুরুষেরা পূর্বে চাষ করত পরবর্তী সময়ে তারা কাঁকড়া ধরা পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় এও দেখা গেল, যারা মাছ-কাঁকড়া ধরত ও চাষও করত এমন পরিবারের সন্তানেরা পরবর্তী সময়ে খুব কমই এই পেশায় এসেছে। আবার যারা দিনমজুর ছিল, সব ধরনের কাজ করত তাদের পরিবারের কেউই আর এই পেশায় আসে নি। কি এর কারণ হতে পারে ? তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় নি।

৬.৩ কাঁকড়া ধরার পেশায় স্থায়িত্বগত অনুসন্ধান:

যারা বর্তমানে কাঁকড়া ধরছে তারা প্রত্যেকেই এই পেশায় দীর্ঘ দিন ধরে যুক্ত রয়েছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই পেশায় আসার খুব একটা প্রবণতা দেখা যায় না। নানা বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা ও স্থানান্তরে কাজ করতে যাওয়ার প্রবণতা তাদের কে এই পেশা থেকে বিমুখ করছে। যারা এখনও কাঁকড়া ধরছে তারা কেউ ১০ বছর, কেউবা ২০ থেকে ৩০ বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত আছেন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় তাদের কাছ থেকে এই পেশায় নিযুক্ত থাকার সময় সীমা সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায় তা এইরূপ:

১-১০ বছর	১০-২০ বছর	২০-৩০ বছর	৩০-৪০ বছর	৪০-৫০ বছর
৬	১৯	১৩	৯	৩

এখানে দেখা যাচ্ছে যারা মোটামুটি ১০ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমন লোকের সংখ্যা ৬ জন। আবার ২০ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমন লোকের সংখ্যা ১৯ জন। ১৩ জন ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যারা প্রায় ৩০ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আবার ৪০ বছর যুক্ত রয়েছে এমন লোকের সংখ্যা ৯ জন। তবে ৫০ বছর এই কাজ করছে এমন ব্যক্তি সব থেকে কম। নিম্নে একটি পাই চার্টের মাধ্যমে বিষয়টি আরও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হল।

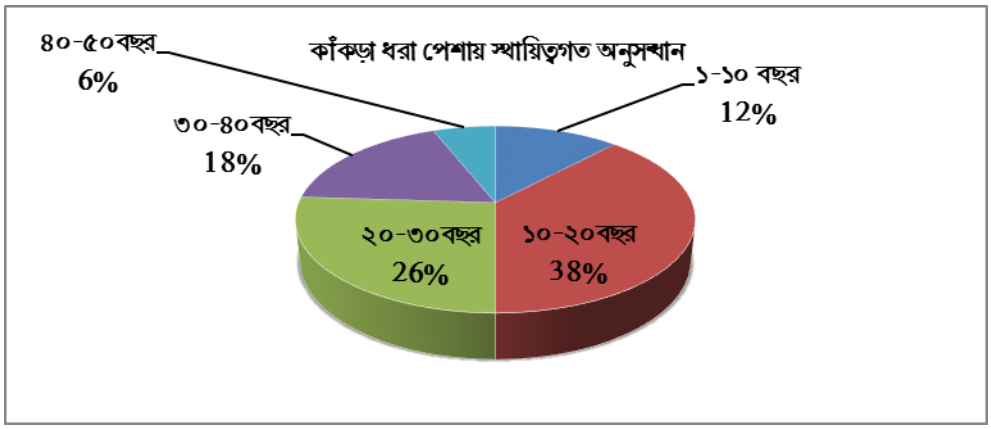

পাইচার্টটিতে দেখা যাচ্ছে ১২ শতাংশ মানুষ ১০ বছর ধরে কাঁকড়া ধরছে। আবার ২০ বছর ধরে কাঁকড়া ধরছে এমন লোকের সংখ্যা ৩৮ শতাংশ। অন্যদিকে ৩০ বছর এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমন লোকের সংখ্যা প্রায় ২৬ শতাংশ। অপর দিকে ১৮ শতাংশ ব্যক্তিকে পাই যারা ৪০ বছর ধরে এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। সব থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল যারা অন্তত ৫০ বছর এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। প্রায় ৫০ বছর ধরে যুক্ত রয়েছে এমন কাঁকড়াজীবীর সংখ্যা ৬ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় যে সব থেকে বেশি বছর ধরে

কাঁকড়া ধরছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস যাচ্ছে। তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলে কাঁকড়া ধরা জীবিকায় কর্মরত ব্যক্তিদের জীবিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ কি ? ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলের আদি বাসিন্দা যারা মূলত মাছ, কাঁকড়া ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত তারা অধিকাংশই জঙ্গলের কোন না কোন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। অপর দিকে বয়স বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই তাদের এই পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। অনেকে আবার বাঘের আক্রমণের ভয়ে এই পেশা ছেড়ে দিয়েছে। নতুন প্রজন্মের দিকে তাকালেও দেখা যায় তারা কাঁকড়া ধরা পেশাকে তেমন আনন্দের সাথে গ্রহণ করছে না। কারণ বহুবিধ। যেমন, অন্য রাজ্যে কাজের সুযোগ, কাঁকড়া ধরা পেশায় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বিপদের সম্ভাবনা, জঙ্গল রক্ষকদের অত্যাচার, জলদস্যুদের আক্রমণ প্রভৃতি কারণের জন্য আজ এই পেশায় নতুন প্রজন্মের তেমন আশানুরূপ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। যাই- হোক সুন্দরবন অঞ্চলের এই পেশা যে একটি ঐতিহ্যবাহী পেশা তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না।

৭. কাঁকড়া ধরায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠীদের অর্থনৈতিক অবস্থা:

পূর্বেই এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে যে সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। দিন আনা দিন খাওয়া এই সমস্ত লোকেদের প্রতিনিয়ত নানা প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। মাসে দুটি কোটালে কারো দু'হাজার কারো বা তিন হাজার টাকা উপার্জন হয়, পাঁচ-সাত জন পরিবার সদস্য নিয়ে এই উপার্জনে খুব কষ্টেই দিন গুজরান হয়। কোন উপায় না থাকায় তাই বাধ্য হয়েই আবার কাঁকড়া ধরতে যেতে হয়। এছাড়াও মহাজনদের অত্যাচার, কাঁকড়ার সঠিক দাম না পাওয়া, জঙ্গল আধিকারিকদের (Forrest Ranger Officer) অলিখিত দাবী, প্রভৃতি ছাড়িয়ে যেটুকু উপার্জন হয় তাতে কোন রকমে সংসার চলে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে তাদের জমির পরিমাণ, বাসস্থান, র‍্যাষণকার্ড কোন তালিকাভুক্ত, পরিবারে অভাবের পরিমাণ কেমন, তাঁরা কোথাও ফিক্স ডিপজিট করে কিনা, জীবনবীমা রয়েছে কিনা প্রভৃতি বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা হল:

৭.১ কাঁকড়াজীবীদের স্থাবর-অস্থাবরগত অনুসন্ধান :

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যারা কাঁকড়া ধরা পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তারা মূলত: নদীর তীরবর্তী স্থানে বসবাস করে। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করার ফলে তাদের যে সুবিধাজনক দিকগুলি রয়েছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে আর একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা যায়। এরা যে শুধু কাঁকড়া ধরার সুবিধার জন্য নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে তা নয়, অর্থনৈতিক কৃচ্ছলতা তাদেরকে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য করছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলে যে তথ্য উঠে এসেছে তা দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

জলজমি	বাস্তুজমি	জলজমি ও বাস্তুজমি	বাস্তুহারা
৬	২৭	৯	৮

এখানে দেখা যাচ্ছে কাঁকড়া ধরা জীবিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমন ৫০ জন ব্যক্তির মধ্যে ন'জন ব্যক্তির চাষের উপযোগী জলজমি রয়েছে। বাস্তুজমি রয়েছে সাতাশ জন ব্যক্তির। আবার ন'জন ব্যক্তি রয়েছে যাদের জলজমি ও বাস্তুজমি উভয় রয়েছে। সেই সঙ্গে আট জন ব্যক্তি রয়েছে যাদের জলজমি কিংবা বাস্তুজমির কোনটাই নেই। এরাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে খাস জমিতে বসবাস করে।

উপরের বারগ্রাফটিতে দেখা যাচ্ছে জলজমি রয়েছে এমন কাঁকড়াজীবীর সংখ্যা খুব কম। আবার শুধু বাস্তু জমি রয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা সব থেকে বেশি। যাদের জলজমি ও বাস্তুজমি রয়েছে তাদের সাথে বাস্তুহারাদের তুলনা করলে দেখা যাবে এদের অনুপাত প্রায় সমান সমান। যাদের জলজমি রয়েছে তারা প্রধানত কৃষিজীবী। কাঁকড়া ধরা এদের প্রধান পেশা নয়। বছরের কখনো কখনো এরা কাঁকড়া ধরার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গিয়েছে বছরের যে সময় কৃষিকাজ প্রায় থাকে না বললে চলে সেই সময় এরা কাঁকড়া ধরার কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে তাতে এদের কিছুটা হলেও আর্থিক সহায়তা হয়। আবার যখন কৃষিকাজের সময় হয় তখন কাঁকড়া ধরা বন্ধ করে কৃষিকাজ করে। যাদের শুধুমাত্র বাস্তুজমি রয়েছে, চাষের জমি বিন্দুমাত্র নেই তারা কিছুটা হলেও একটু বেশি পরিমাণে নদীর মাছ কাঁকড়ার ওপর নির্ভরশীল। এরা প্রায় প্রতিনিয়ত নদীতে কাঁকড়া ধরতে যায়। এই শ্রেণির লোকের সংখ্যা সব থেকে বেশি। আবার যাদের জলজমি ও বাস্তুজমি রয়েছে তারা কৃষিকাজও করে আবার মাছ কাঁকড়াও ধরে। তবে যে সব ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, যাদের জলজমি বা বাস্তুজমি কিছুই নেই তারাই সম্পূর্ণভাবে কাঁকড়া ধরা পেশার ওপর নির্ভরশীল। তবে এই বারগ্রাফটিতে সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের কৃষিজমি বা বাস্তুজমি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

৭.২ গৃহকাঠামোগত অনুসন্ধান:

গৃহ পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা নিরুপণের আর একটা বড় মাধ্যম। সুন্দরবনের নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীরা অধিকাংশই কাঁচা অথবা কাঁচা-পাকা ঘরে বসবাস করে। বেশ কিছু বছর পূর্বে 'আয়লা' হয়ে যাওয়ার ফলে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক কাঠামো আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলে কাঁচা ঘর, পাকা ঘর, কুঁড়ে ঘর, কাঁচা-পাকা ঘর, সব ধরনের বাসগৃহ দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে কাঁকড়াজীবীদের বাসস্থান সম্পর্কিত যে তথ্য উঠে এসেছে তা এই রকম।

পাকাঘর	কাঁচাঘর	কাঁচা-পাকা ঘর	কুঁড়েঘর
৯	২৯	১১	১

এখানে দেখা যাচ্ছে পাকাঘরে বাস করে এমন কাঁকড়াজীবীর সংখ্যা ন'জন। আবার কাঁচা ঘরে বাস করে এমন ব্যক্তির সংখ্যা উনত্রিশ জন। কাঁচা-পাকা অর্থাৎ যে সমস্ত ঘরের দেওয়াল ইটের আর ছাউনি টালি কিংবা অ্যাসবেস্টসের, তেমন বাড়িতে বসবাস করে ১১ জন। তবে কুঁড়ে ঘরের সংখ্যা খুব কম। মাত্র একজন ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছে যে কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে।

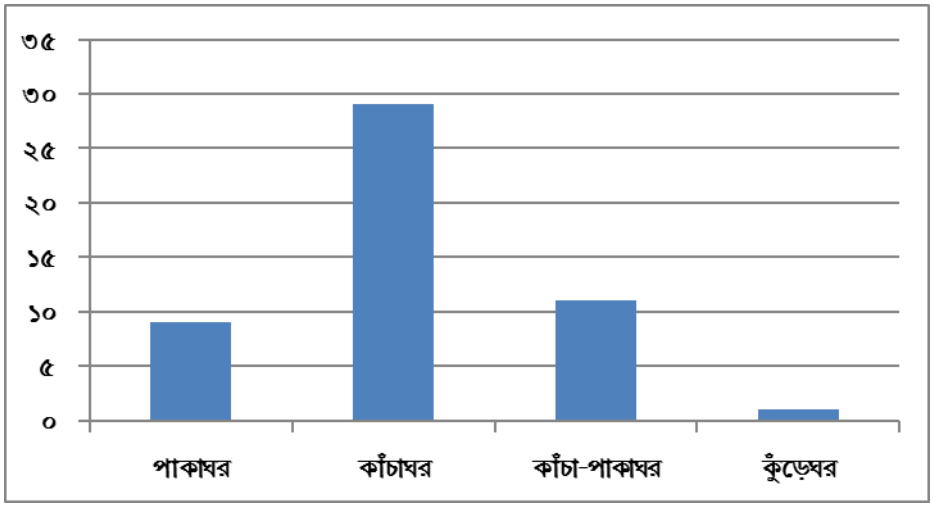

উপরোক্ত বারগ্রাফটিতে পাকা ঘরের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হতে পারে কাঁকড়াজীবীদের বেশ কিছু অংশ পাকা ঘরে বসবাস করে। আসলে পূর্বে উল্লিখিত গ্রাফে দেখানো হয়েছে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের মধ্যে বেশ কিছু ব্যক্তিবর্গের চাষের জমি রয়েছে। আসলে এখানে পাকা ঘরের অধিকারী তারাই যাদের বেশ কিছু চাষের জমি রয়েছে। এদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কারণ কাঁকড়া ধরা নয়, কৃষিকাজই এই শ্রেণির মানুষের অর্থ উপার্জনের প্রধান পথ। যারা কাঁচা ঘরে বাস করে তাদের সংখ্যা সব থেকে বেশি। আবার কাঁচা-পাকা ঘরে বাস করে এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে যারা কাঁচা-পাকা ঘরে বাস করে তাদের অধিকাংশেরই মৎসজীবী কার্ড রয়েছে। মৎসজীবী কার্ড যাদের রয়েছে তারা প্রায় প্রত্যেকেই 'আয়লা'র ফলে সরকারী অনুদানে ঘর পেয়েছে। সে ঘরগুলির দেওয়াল ইঁটের, ছাউনি অ্যাসবেস্টসের, ফলে সেগুলিকে কাঁচা-পাকা ঘর হিসেবেই ধরা হয়। কাঁকড়া ধরার সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তিদের মৎসজীবী কার্ড রয়েছে তারা প্রায় প্রত্যেকেই ঐ অনুদানের ঘর পেয়েছে। অপরদিকে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কুঁড়ে ঘরের সংখ্যা সব থেকে কম। মাত্র একজন ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছে যে কুঁড়ে ঘরে বাস করে। ফলে এদিক থেকে সুন্দরবনের অর্থনৈতিক কাঠামো কিছুটা হলেও ভালো বলা যায়।

৭.৩ র‍্যাশন কার্ডের ধরন অনুযায়ী অন্তর্ভূক্তিগত অনুসন্ধান:

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাই করে, র‍্যাশন কার্ড কি ধরনের হবে তা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত বাসগৃহের ধরন (Type of house), সন্তান-সন্ততি (Status of children), খাদ্য চাহিদা (Food requirement), পোশাক-আশাক (Clothing), সাক্ষরতা (Literacy status), জমি-জমার পরিমাণ (Landholding), শৌচালয় (Sanitation), প্রভৃতির বিচারে পরিবারের র‍্যাশন কার্ড নির্ধারণ করা হয়। তবে এও স্বীকার করতে বাঁধা নেই যে সব ক্ষেত্রে পরিবারের র‍্যাশন কার্ডের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। তবে র‍্যাশন কার্ডের ধরন অনেকটাই পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাই করতে সাহায্য করে। সাধারণত তিন ধরনের র‍্যাশন কার্ড হয় যেমন- A.P.L (Above Poverty Line), B.P.L (Below Poverty Line), Antyodya, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী তারাই এপিএল র‍্যাশন কার্ডের অধীনস্থ, যারা জীবনের ন্যূনতম চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) পুরণে সক্ষম কিন্তু তাদের আয়ের অনুপাতে তারা গরীব।[১] অপরদিকে যারা বছরে ২০,০০০ হাজার টাকার কম উপার্জন করে তারা বি.পি.এল তালিকা ভূক্ত।[২] আবার যাদের মাসিক ২৫০ টাকার বেশি উপার্জন হয় না তারা অন্তদয় তালিকার অন্তর্গত।[৩] প্রসঙ্গক্রমে ক্ষেত্রসমীক্ষায় র‍্যাশন কার্ড সম্পর্কিত যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল।

এ.পি.এল	বি.পি.এল	অন্তদয়	নেই
৭	৩৪	৯	০

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেল ৫০ জন ব্যক্তির মধ্যে ৭ জন রয়েছে যারা এ.এপি.এল (A.P.L) অন্তর্ভুক্ত। আবার ৩৪ জন ব্যক্তিকে পাওয়া গেল যারা বি.পি.এল (B.P.L) অন্তর্ভুক্ত। অন্তঃদয়ের সংখ্যা ৯ জন। কিন্তু র‍্যাশন কার্ড নেই এমন ব্যক্তি পাওয়া গেল না। এ থেকে অনুমান করা যায় যারা কাঁকড়া ধরে তারা সরকারী সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন রয়েছে।

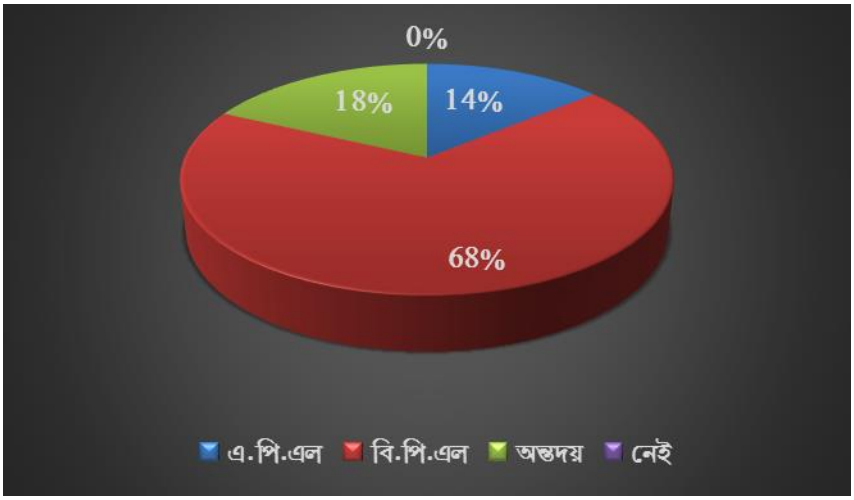

ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে যে পাই চার্ট পাওয়া গেল তাতে দেখা যাচ্ছে ১৪ শতাংশ কাঁকড়াজীবী রয়েছে যারা এপিএল তালিকার অন্তর্গত। আবার ৬৮ শতাংশ রয়েছে বিপিএল তালিকার অন্তর্গত। অন্তদয় রয়েছে ১৮ শতাংশ। এ তথ্যের মধ্যে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ৬৮ শতাংশ কাঁকড়াজীবী রয়েছে যারা বছরে ২০,০০০ হাজার টাকার কম উপার্জন করে। অর্থাৎ এদের মাসে উপার্জন ১৬০০ টাকার কাছাকাছি। যে পরিবারে ৬-৭ জন সদস্য সংখ্যা সে পরিবারে দিনে ৫৫ টাকা উপার্জন হলে কিভাবে অন্ন-সংস্থান সম্ভব তা বলা খুব কঠিন। যে ১৪ শতাংশ ব্যক্তি এপিএল তালিকার অন্তর্গত, তাদের প্রত্যেকেরই হয় নৌকা না হয় চাষের জল জমি রয়েছে। ফলে তারা কিছুটা হলেও স্বচ্ছন্দে রয়েছে। আবার ১৮ শতাংশ কাঁকড়াজীবী রয়েছে যারা অন্তদয় তালিকার অন্তর্গত। এদের মাসে ২৫০ টাকা উপার্জন হয়। বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুন্দরবনে ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে দেখা গিয়েছে অনেক পরিবারই রয়েছে যাদের কাঁকড়া ধরার চার কেনার জন্য ১০০ টাকা খরচ করবার মতো সামর্থ্য নেই। ফলে সুন্দরবনের এই অর্থনৈতিক পরিসংখ্যাটি যে সকলকে কিছুটা হলেও ভাবিয়ে তুলবে তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না।

৭.৪ অর্থ সঞ্চয়গত অনুসন্ধান:

সঞ্চয় জীবনের একটা অঙ্গ। যদি পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে তবে সঞ্চয়ের প্রশ্ন ওঠে না। যারা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না তাদের কাছে সঞ্চয় একটা স্বপ্ন। সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরে তারা যে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সঞ্চয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উঠে আসে সঞ্চয়ের স্থানের কথা। সুন্দরবন অঞ্চলে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোগের তেমন কোন নজির পাওয়া যায় না। শহরকেন্দ্রিক কিছু ব্যাঙ্ক থাকলেও সেখানে গিয়ে অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কাঁকড়াজীবীদের কিছুটা অনীহা রয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে তেমন কোন সমবায়ও চোখে পড়ে নি। ফলে অর্থ সঞ্চয়ের বিষয়ে এরা খুবই অজ্ঞ। পোস্ট অফিস কিংবা

এল.আই.সির (LIC) ক্ষেত্রে পোস্ট মাস্টার ও এল.আই.সির প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে গ্রামের লোকেরা এদের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। সেই সঙ্গে চিট ফাণ্ডের প্রতারণা সুন্দরবন অঞ্চলের এই সকল সাধারণ মানুষদের অর্থ সঞ্চয়ের আগ্রহ থেকে আর এক ধাপ পিছিয়ে দিয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা কার্যের মাধ্যমে কাঁকড়াজীবীদের অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে যে তথ্য উঠে এসেছে তা এই রকম:

ফিক্স ডিপোজিট করে	ফিক্স ডিপোজিট করে না
৩	৪৭

কাঁকড়া ধরে এমন যে ৫০ জন তথ্য দাতাকে পাওয়া গেল তাদের মধ্যে ৩জন ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছে যারা টাকা সঞ্চয় করে। বাকি ৪৭ জন ব্যক্তি যারা টাকা সঞ্চয় করে না। এই তথ্য থেকে যে পাইচার্ট নির্ণয় করা যায় তা নিম্নে উপস্থাপিত হল।

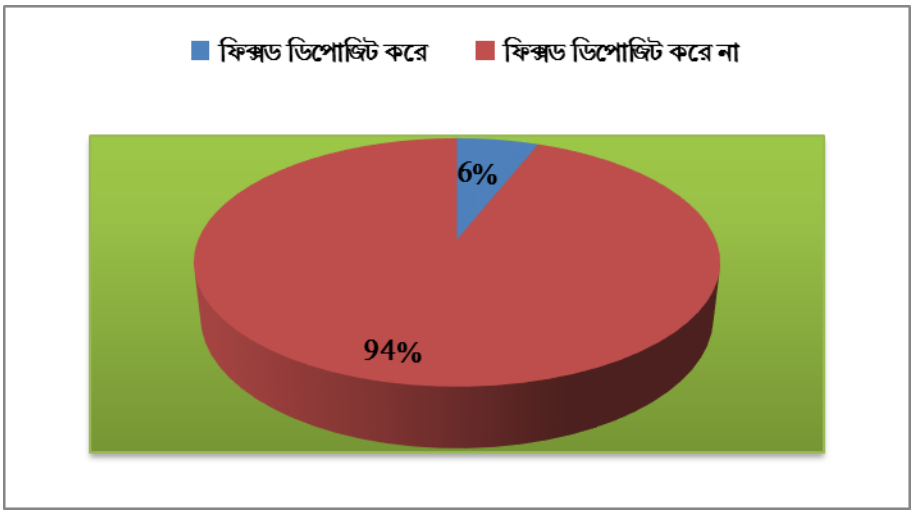

দেখা যাচ্ছে ৬ শতাংশ কাঁকড়া জীবীরা কোথাও না কোথাও অর্থ সঞ্চয় করে। বাকি ৯৪ শতাংশ ব্যক্তিরা অর্থ সঞ্চয় করে না। তাদের অর্থ সঞ্চয় না করার যে প্রধান কারণগুলি রয়েছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সরকারী বা বেসরকারী যাই হোক না কেন এই সমস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের কিছুটা উৎসাহ বা সঞ্চয়ের সুবিধার দিকগুলি তুলে ধরতে পারলে এদের অর্থসঞ্চয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৭.৫ অভাবগত অনুসন্ধান:

সুন্দরবন অঞ্চলে কাঁকড়াজীবীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত অনুসন্ধান করতে গিয়ে পরিবারের অভাব অনটনের দিকেও নজর রাখতে হয়েছে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুসারে তা হল:

অভাব খুব বেড়েছে	অভাব অল্প বেড়েছে	অভাব একই রকম আছে	অভাব একদমই বাড়ে নি
৫	১২	৩৩	০

যে ৫০ জন তথ্যদাতাকে পাওয়া গিয়েছে তাদের অভিমত অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ৫ জন কাঁকড়াজীবী রয়েছে যাদের অভাব খুব বেড়েছে। আবার অভাব অল্প বেড়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ১২ জন। অভাব বাড়েওনি বা কমেও নি এমন ব্যক্তির সংখ্যা সব থেকে বেশি। এই ৩৩ জন ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছে যাদের সংসারের হাল হকিকত প্রায়

একই রকম রয়েছে। তবে এমন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি যার সংসারের অভাব একদম বাড়ে নি। এই তথ্য থেকে যে বার গ্রাফ পাওয়া যায় তা এই রকম:

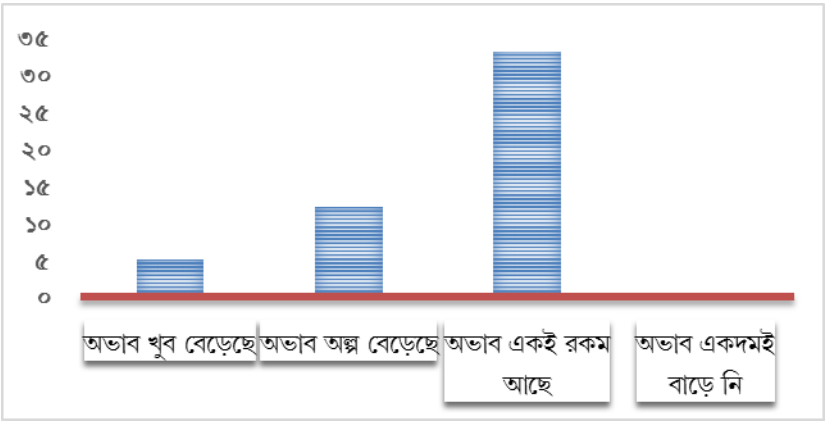

বার গ্রাফের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অভাব খুব বেড়েছে এমন লোকের বারটি খুব কম উঠেছে। আবার অল্প বেড়েছে এই বারটি একটু বেশি উঠেছে। অভাব একই রকম রয়েছে সব থেকে বেশি উঠেছে। অভাব একদমই বাড়ে নি এমন লোক পাওয়া যায় নি। আসলে যারা বলেছে অভাব খুব বেড়েছে তাদের ২০০৮ -এর আয়লায় সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। এও দেখা গিয়েছে শারীরিক অসুস্থতা বা জঙ্গলে গিয়ে বাঘের আক্রমণে পরিবারের মূল উপার্জক প্রাণ হারিয়েছে। ফলে ঐ সমস্ত পরিবারের মূল অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। তাই তাদের অভাব খুব বেড়েছে। আবার অভাব অল্প বেড়েছে যাদের তারা খাটা খাটনির ফলে অথবা পরিবারের কেউ বাইরে কাজ করতে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে সংসারের অবস্থা কিছুটা ফিরিয়েছে। ফলে এদের অভাব কিছুটা হলেও কম আছে। তৃতীয় বারটি অনুযায়ী বলা যায় সুন্দরবনের অধিকাংশ কাঁকড়াজীবীর অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় একই রকম রয়েছে। যদিও অভাব বাড়ে নি এমন ব্যক্তিকে পাওয়া যায় নি।

৮. কাঁকড়া ধরায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠীদের লোকবিশ্বাস-সংস্কার:

যে কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যেই তাদের জীবিকাকে কেন্দ্র করে কিছু লোকবিশ্বাস-সংস্কার লক্ষ্য করা যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরে তারা এর ব্যতিক্রম নয়। সুন্দরবনের এই কাঁকড়াজীবীদের মধ্যে জঙ্গল ও পেশাকেকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লোকবিশ্বাস-সংস্কারের প্রচলন দেখা যায় । তাদের এই বিশ্বাস-সংস্কারগুলি পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

- জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বে নিকটবর্তী কোন জাগ্রত বনবিবির থান থেকে 'আদেশ কাটাতে' হয়। আদেশ কাটানো অর্থাৎ জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি। সাধারণত সকালের দিকে বনবিবির পুজো হয়। জঙ্গলে যখন যারা যায় তখন তাদের দল-প্রধান মায়ের উদ্দেশ্যে পুজো দেয় ও একটি ফুল মায়ের পায়ের ওপর রাখে যদি সেই ফুল না পড়ে তবে জঙ্গলে যাওয়ার আদেশ মেলে না আর যদি ফুল পড়ে যায় তবেই জঙ্গলে যাবার আদেশ পায়। তবে এই পুজোর ক্ষেত্রেও পরিবারের কিছু নিয়ম রয়েছে। যে বনবিবির থানে পুজো দিতে যায় তার যতক্ষণ না পুজো দেওয়া হয় ততক্ষণ বাড়িতে রান্না বসানো যায় না। সাধারণত বেলা ১২টার মধ্যে পুজো হয়ে যায়, তাই ১২টার পরে পরিবারে রান্না শুরু হয়।

- জঙ্গলে যাওয়ার আদেশ পেয়ে গেলে চালান (প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যা সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়) তোলার ব্যবস্থা করতে হয়। তবে এই চালান যে কোন সময় তোলা যায় না। পঞ্জিকা দেখে তিথি, গোন অনুযায়ী চালান তোলা হয়।

- ❖ সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে নৌকা ছাড়ার সময় হয়। সাধারণত সকালের দিকে নৌকো ছড়া হয়। নৌকোতে পুজো দিয়ে নৌকার 'চণ্ডীতে'(মাথায়) জল দিয়ে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরে তবেই নৌকোতে উঠে নৌকা ছাড়ে।
- ❖ জঙ্গলে যারা কাঁকড়া ধরতে যায় তারা বিশ্বাস করে জঙ্গলে প্রবেশ করা মাত্র তারা মা বনবিবির কোলে আশ্রয় নেয়। সমগ্র জঙ্গলকেই তারা মা বনবিবির আধার বলে কল্পনা করে। তাই জঙ্গলে প্রবেশ করার পর থেকে কোনভাবেই মুখের থুতু ফেলে না।
- ❖ যখন ১০-১২ দিনের পরিকল্পনায় জঙ্গলে যায় তখন সমস্ত খাবার সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। এই খাবার নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বেশ কিছু বিধি নিষেধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নারকেল, দুধ, ডিম, কলা, মাংস, কচু, ওল, তাল, প্রভৃতি উপকরণগুলি তারা সঙ্গে নিয়ে যায় না। 'তাল' প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। যেমন 'তাল না কাল' অর্থাৎ তাল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মানে 'কাল' অর্থাৎ বিপদকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া।
- ❖ পরিবারের লোকজন যারা বাড়িতে থাকে তাদের মধ্যেও কিছু বিশ্বাস-সংস্কার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, এই সময় বাড়িতে পিঠে পার্বণ হয় না।
- ❖ কাঁচা কলা রান্না হয় না।
- ❖ চাপাকল থেকে জল নেওয়ার সময় যাতে কলসি উপচে জল না পড়ে সে দিকে নজর রাখে। কলসি উপচে জল পড়লে নাকি অমঙ্গল হয়।
- ❖ বাড়িতে ধান চাল সিদ্ধ ও শুকনো করা হয় না।
- ❖ জামা কাপড় সার্ফ বা সাবান দিয়ে কাচা হয় না।
- ❖ উঠোনে বা ঘরে গোবর জল দেওয়া যায় না।
- ❖ উঠোন বা ঘর লিপতে হলে তা সূর্য ওঠার পূর্বেই সেরে ফেলে।
- ❖ রান্নার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনুনের আগুন নিভিয়ে জল দিয়ে ভালো করে উনুন মুছে নেয়।
- ❖ পরিবারের স্ত্রী-বৌয়েরা সাধারণত মাথায় তেল সিঁদুর ব্যবহার করে না।

এই ক্ষেত্রসমীক্ষায়, যারা কাঁকড়া ধরতে যায় তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের ওপর অনেকটা জোর দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে মূল উপজীব্য বিষয় ছিল যারা কাঁকড়া ধরে তাদের মধ্যে মাদুলি অথবা তাবিজ সংক্রান্ত কোন বিশ্বাস-সংস্কারের প্রচলন রয়েছে কিনা ? এই প্রশ্নের উত্তরে যে তথ্য উঠে এসেছে তা এই রকম:

তাবিজ-কবজ ব্যবহার করে	**তাবিজ-কবজ ব্যবহার করে না**
১৭	**৩৩**

উল্লিখিত তথ্যদাতাদের মধ্যে ১৭ জনকে পাওয়া গিয়েছে যারা তাবিজ-কবজ ব্যবহার করে। তারা এও বিশ্বাস করে যে বিপদ থেকে এই তাবিজ তাদের রক্ষা করে। কিন্তু ৩৩ জন ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছে যারা তাবিজ-কবজ বিশ্বাস করে না। এই তথ্য থেকে যে পাই চার্ট নির্ণয় করা যায় তা এই রকম:

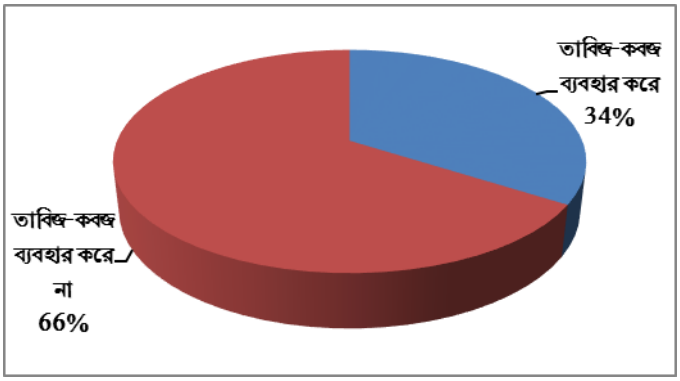

পাইচার্টটির মাধ্যমে থেকে আমরা যা পাই তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৩৪ শতাংশ ব্যক্তি তাবিজ-কবজ ব্যবহার করে। আবার ৬৬ শতাংশ মানুষ রয়েছে যারা তাবিজ-কবজ বিশ্বাস করে না বা ব্যবহার করে না। এখন প্রশ্ন হল একই পেশায় অন্তর্গত বা একই স্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে এই ধরনের ভিন্ন রীতির কারণ কি? বিশ্বাস-সংস্কারের দিক দিয়ে এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যারা তাবিজ কবজ ব্যবহার করে না। তারা অধিকাংশই থবগা সুত ব্যবহার করে কাঁকড়া ধরে। পূর্বেই দেখানো হয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরে তাদের একটি বড় অংশ থবগা সুতের সাহায্যে কাঁকড়া ধরে। যারা প্রতিদিন থবগা নিয়ে কাঁকড়া ধরতে যায় এবং অপরাহ্নে বাড়ি ফিরে আসে তাদের খুব একটা বিপদের মধ্যে পড়তে হয় না। ফলে এদের মধ্যে জঙ্গলকেন্দ্রিক বিশ্বাস-সংস্কার কিছুটা কম। যে ৬৬ শতাংশ ব্যক্তিকে দেখি তাবিজ-কবজ ব্যবহার করে না তারা এই থবগা সুতের সঙ্গে যুক্ত। বাকি যে ৩৪ শতাংশ ব্যক্তি রয়েছে, তারা চাপানে যায়। এরা কেউ গর্ততাড়া কেউ বা দনের সাহায্যে কাঁকড়া ধরে। এই পদ্ধতির সঙ্গে যারা যুক্ত স্বভাবত তাদের বিপদের আশঙ্কা একটু বেশি তাই এদের মধ্যেই তাবিজ-কবজে বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। তাই এই দিক দিয়ে বিচার করলে এদের এই ভিন্নতার কারণ গ্রহণযোগ্য।

৯. কাঁকড়া ধরায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠীদের কিছু সমস্যা ও সমাধানের পথ:

সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঁকড়া ধরা পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। আজ তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন। বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Worming) পরিবেশকে বিপন্ন করছে। জঙ্গল বাঁচাতে হবে, চারিদিকে এমন একটা প্রস্তুতি চলছে। তাই পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে সাড়া আসছে সুন্দরবনকে বাঁচাও। কিন্তু সুন্দরবন বাঁচাতে গিয়ে যাদের ক্ষতি হচ্ছে তাদের কথা ভাবা হচ্ছে না। এর ফলে যারা সুন্দরবনের নদ-নদীর ওপর নির্ভর করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত তারা না সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় যে সমস্যাগুলি চোখে পড়েছে ও ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা যা বলেছে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত: বর্তমানে কাঁকড়াজীবীদের প্রধান সমস্যা তারা কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার জন্য বৈধ পাশ পাচ্ছে না। অনেকটা চুরি করে বা লুকিয়ে কাঁকড়া ধরতে যেতে হয়। এতে Forrest Officer দের হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকে। যারা ধরা পড়ে তারা ভীষনভাবে নিগৃহীত হয়। এই সমস্যা দূর করার জন্য সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। বেশিরভাগ কাঁকড়াজীবী এটা জানেও না যে সরকারি ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ রয়েছে কিনা। ফলে এখানেই সমস্যাটির সূত্রপাত। তাই কাঁকড়াজীবীদের যেমন এবিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে তেমনি সরকারি উদ্যোগে বিষয়টি সকলের অবগত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: কাঁকড়া ধরা ব্যক্তি আর সর্বোচ্চ বা সর্বশেষ বড় ক্রেতা -এই দুইয়ের মাঝে অজস্র অসাধু ব্যক্তির উপস্থিতি রয়েছে, যাদের হাতে মুনাফার বেশিরভাগ অংশ চলে যায় তাদেরকে সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিতে হবে। মাঝে

যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি না থাকে তবে কাঁকড়াজীবীদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এর জন্য চাই খোলা বাজার (Open Market) যেখানে বড় ব্যবসায়ীরা সরাসরি কাঁকড়াজীবীদের কাছ থেকে কাঁকড়া কিনতে পারবে। এই উদ্যোগ সরকারি বা বেসরকারি উভয়ভাবেই নেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয়ত: কাঁকড়া ধরতে যারা যায় তাদের কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার পূর্বে অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই অর্থের জোগান আসে অসাধু কাঁকড়া ব্যবসয়ীদের কাছ থেকে। এর ফলে যারা কাঁকড়া ধরে আনে তারা ঐ অর্থ ধার দেওয়া ব্যক্তির কাছে যে কোন দামেই কাঁকড়া বিক্রয় করতে বাধ্য থাকে। এতে কাঁকড়াজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কোন সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বারা যদি এদের কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার জয় আর্থিক সহায়তা করা যায় তাহলে কাঁকড়াজীবীরা ভীষণভাবে উপকৃত হবে।

চতুর্থত: জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বিপদে পড়লে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে বাঘের দ্বারা আক্রান্ত বা বিষধর সাপের কামড়ে জখম ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসা করার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই এই দিকটির প্রতি যদি সরকারিভাবে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে সুন্দরবনে এই দুস্থ অধিবাসীদের কিছুটা হলেও সুবিধা হয়।

পঞ্চমত: জঙ্গলে যারা কাঁকড়া ধরতে যায়, তাদের প্রতি পদে পদেই বিপদ থাকে। কিন্তু সব কিছু জেনে শুনেও তারা কখনই জীবনবীমা (Life Insurance) করায় না। অধিকাংশ ব্যক্তি জানেই না কিভাবে জীবনবীমা করাতে হয় বা এর কি কি সুবিধা রয়েছে। ফলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কোন ব্যক্তি যদি কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় তাহলে ঐ পরিবার সরকারিভাবে কোন সাহায্য পায় না। ধীরে ধীরে ঐ পরিবারটি আর্থিক অনটনে পড়ে যায়।

ষষ্ঠত: প্রতি বছরই বাঘের হাতে প্রচুর লোক মারা যায় যেমন এ বছরও কুলতলি থানার অন্তর্গত গ্রামগুলি থেকে ১২ জন বাঘের আক্রমণে মারা গিয়েছে। এ ঘটনা নতুন নয়, সবাই জানে জঙ্গলে বাঘ রয়েছে সেখানে গেলে বাঘে আক্রমণ করতেই পারে। কিন্তু বাঘ সাধারণত মানুষের মাথা ও ঘাড় লক্ষ্য করে আক্রমণ করে তাই হেলমেট জাতিয় কোন শক্ত কিছু যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে বাঘে আক্রমণ করলেও বাঘের সাথে কিছুক্ষণ লড়াই করা সম্ভব হয়। তাই এই সমস্যার দিকটিতেও নজর দেওয়া যেতে পারে।

সপ্তমত: সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যত কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয় তার বেশিরভাগ অংশই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাদবপুর ও বাঘাযতীনে কাঁকড়া রপ্তানির বড় বড় কম্পানি রয়েছে। সংগৃহীত সমস্ত ভালো কাঁকড়া ছোট ব্যবসায়ীদের হাত হয়ে এখানেই আসে। কাঁকড়া ব্যবসায়ীদের কথা অনুযায়ী প্রতিনিয়ত কাঁকড়ার দাম ওঠা পড়া করে। এর কারণ হিসেবে তারা বলেছে কাঁকড়ার দাম বিশ্ব অর্থনীতি বাজারের (World Economy Market) ওপর নির্ভরশীল। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, যে দ্রব্য থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ রয়েছে তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন এত অবহেলা হচ্ছে। বিদেশে এই সমস্ত অর্থকরী দ্রব্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে যতটা উদ্যোগ নেওয়া হয় আমাদের দেশে যে ততটা উদ্যোগ নেওয়া হয় না তা সকলেই স্বীকার করবেন। যদি সঠিকভাবে এই কাঁকড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দিকে নজর দেওয়া হয় তাহলে কাঁকড়া সংগ্রহকারী তথা সুন্দরবনের অনেক উন্নতি হতে পারে। সার্বিকভাবে সুন্দরবনের অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটতে পারে।

উপসংহার:

সুন্দরবন অঞ্চলে এখনো অনেক পেশা রয়েছে, যার মূল ভিত্তি হল ঐতিহ্যগতজ্ঞান। মাছ ধরা, জঙ্গলে কাঠ কাটা, পাখি শিকার প্রভৃতির পাশাপাশি কাঁকড়া ধরা পেশাও সম্পূর্ণভাবে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এই পেশায় আসতে গেলে যেকোন ব্যক্তিকে দীর্ঘ দিন পর্যবেক্ষণ ও অভ্যাস করতে হয়। এই পেশায় যারা এসেছে তারা হয় তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে এই পেশা আয়ত্ত করেছে নতুবা দীর্ঘদিন সহাবস্থানে থেকে এই পেশায় দক্ষ

হয়ে উঠেছে। সুন্দরবনের এই ঐতিহ্যময় পেশাটি আজ বিপন্ন। নানা সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, এই পেশাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। নতুন প্রজন্ম আর এই পেশায় আসতে চাইছে না। কারণ একটাই এই পেশায় অনেক সমস্যা, সেই সঙ্গে উপার্জন কম। সেই সাথে বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার পরিবর্তন ঘটছে ফলে তারা তাদের এই ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এছাড়াও আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই বংশপরম্পরাগত পেশায় না আসার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এখন সময় হয়েছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে এই পেশায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে কিছু সরকারি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। তা না হলে এক দিন হয় তো এই ঐতিহ্যময় পেশাটি হারিয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১.গোস্বামী, মালবিকা, 'সুন্দরবন-জীবন, জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা', সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: এস.এন.দাস এণ্ড কোম্পানি, ২০০০, পৃ: ১৬৭।

২ *www://sapfullform.com/bpl-full-form/ Viewed on 18.05.2016.*

৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র- ২।

৪. *www.http://chdfood.gov.in/Antyodya.aspx. Viewed on 18.05.2016.*

গ্রন্থপঞ্জি:

আবদুল জলিল, এ.এফ.এম, 'সুন্দরবনের ইতিহাস', কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০০।
গোস্বামী, মালবিকা, 'সুন্দরবন-জীবন, জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা', সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: এস.এন.দাস এ্যাণ্ড কোম্পানি, ২০০০।
জানা, দেবপ্রসাদ, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০০৮।
নস্কর, কুমুদ রঞ্জন, 'সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও আমরা', সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০২।
মন্ডল ইসলাম, নাজিবুল(সম্পা), 'সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা', সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা: এস.এন.দাস এ্যাণ্ড কোম্পানি, ২০০০।
মণ্ডল ইসলাম, নাজিবুল(সম্পা), 'সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা', সমকালের জিয়নকাঠি(দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: এস.এন.দাস এণ্ড কোম্পানি, ২০০৮।
মিস্ত্রী, সুভাষ, 'দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজের মন্ত্র' কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০০।
মিত্র, শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২।

ওয়েবসাইট:

http://sundarbannews.blogspot.in/2015/02/honey-collection-season-begins.html. viewed on-13.03.2015
https://lindapluto.wordpress.com/2013/06/02/the-story-of-a-honey-collector-in-sundarbans. Viewed on 20.05.2015
www://sapfullform.com/bpl-full-form/ viewed on 18.05.2016.
www.http://chdfood.gov.in/Antyodya.aspx. Viewed on 18.05.2016